Conversations

September 2022

Convergence

...Of thoughts

From Ma's Desk:

It is hard for me to write "From the Director's Desk", because it is hard to extricate the 'Director of Convergence' identity from Ma, and so I am rather uncomfortable calling myself the 'Director of Convergence'. Rather I am writing these few words, sitting at Ma's desk, as someone who still feels Ma to be present just around the corner, but who is having to fill in her absence for the moment by taking her endeavours forward - that's all. This is the first issue (presently online, that will hopefully be printed at some point, depending on demand) of the annual newsletter of Convergence, christened Conversations which is what this is intended to be - conversations with each other about our feelings and knowledge that we want to share and discuss. This first issue

contains articles and poems many of which are reminiscences that people have spontaneously and overwhelmingly come forward with when Ma left us physically - the way she has touched their lives and philosophy.

I hope you will continue to be by my side with all your blessings, support and wishes, the way you have been beside Ma, in her journey heading Convergence. Thanking you,

Soumyanetra

Summary of activities of Convergence since its inception 5

"সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ঋতা চট্টোপাধ্যায়কে" যতদূর মনে পড়ে... 7

ঋতাদিকে স্মরণ 13

আমার দেখা এক অনন্যা নারী 16

ভালো থাকুন ঋতাদি 18

আমার স্মৃতিতে মাসীমা 21

Rita Di: Eternal Symbol of Wisdom and Sacrifice 24

আমার অসমাপ্ত বই পড়া 26

Rita di 33

Āyurveda as delineated in Someśvara's Mānasollāsa 35

স্মরণে ঋতাদি 43

শ্রদ্ধায় স্মরণে ঋতা দি 44

Rita Chattopadhyay: an extraordinary scholar and organizer 49

ম্যাম্ ও কনভারজেন্স 52

Ma: Here and Now 56

Convergence 60

"ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে" 62

আমাদের সুদীপ্তদা 73

The Medical Fraternity - The Untold Tales of Unkindness and Kindness 75

আধুনিক সংস্কৃত কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাকার বীণাপাণি পাটনীর "অপরাজিতা" শীর্ষক গল্পগ্রন্থের কথা-পঞ্চকে নারীচরিত্রে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ও নারীচৈতন্য জাগরণের আলেখ্য চিত্রণঃ এক সামান্য সমীক্ষা 86

সরস্বতী নদীর দেবীত্বে রূপান্তর 138

Poems 143

They 144

মেলবন্ধন 146

In the car 147

Rains 148

List of books by Rita Chattopadhyay (by year of publication) 150

Summary of activities of Convergence since its inception

Though Convergence is just about nine months old, out of which it has suffered from the loss of its Founder-Director, Professor Rita Chattopadhyay, it has still done substantial amount of work and proceeded towards fulfilling the ends towards which it was established.

Academic Work:

Online Courses: Convergence has been conducting online courses in German, English Oriya, and Music. The current sessions have been concluded and the next sessions are scheduled to begin from November and continue for the next six months. Successful participants have been awarded completion certificates. New courses will be offered in the upcoming session like Sanskrit and hinger levels of English and German, though some existing courses like Oriya and Music will not be offered.

Online Lecture Series: Convergence has started online lecture series that has hosted the following lectures till date: আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য by Founder-Director Professor Rita Chattopadhyay (21st January 2022), "ওয়াটার-ড্রপ-লেট" এর সেকার একাল by Dr Mrityunjay Chakraborty (29th January 2022), মাত্রাজ্ঞান (Sense of proportion) by Dr Anjalika Mukhopadhyay (26th February 2022), আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে "ঠাকুর-মা-স্বামীজী" by Professor Subrata Sen (20th March).

Library: Convergence will soon (from November) open its collection of about five thousand books for public. We will begin by allowing reference work to be done by scholars in the premises of our library itself, and later on expand by allowing selective issuance.

Philanthropic Work:

Medical consultations: Convergence has arranged for medical consultations by eminent physicians (Dr Jayanta Ray and Dr Adrija Rahman Mukherjee, General Medicine, and Dr Soma Mukherjee, paediatrician) twice.

Sit-and-draw Competition: It has also arranged for sit-and-draw competition for children of Charalkhali village.

Felicitation: It has also felicitated senior citizens whose contributions may not have been in the forefront like Jayanti Devi (wife of Nityananda Mukhopadhyay, age 90+), Subarna Mondal (grandmother of Debdas Mondal, Assistant Professor, Sanskrit Department, Jadavpur University, Kolkata), Professor Pabitra Sarkar (renowned oriental scholar), Dr. Anjalika Mukhopadhyay (renowned Sanskrit academician), Pandit Tarapada Bhattacharya (renowned Sanskrit author, age 90+), and Professor Pratap Bandyopadhyay (renowned Sanskrit scholar).

Cultural Work: Convergence has been conducting online Yoga and Music classes.

Beginning of

Conversations

Beginning September 2022, Convergence has commenced the publication of its annual newsletter christened *Conversations.* It will be available on our website

www.convergenceofthoughts.org

Soumyanetra

“সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ঋতা চট্টোপাধ্যায়কে” যতদূর মনে পড়ে...

শিশির কুমার রায়

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবে কখন কোথায় কিভাবে প্রথম আলাপ হয়েছিল সেকথা আজ আর মনে নেই। হয়ত সেসবের আজ আর কোনও প্রয়োজনও নেই। মানুষ সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এবং রীতা চট্টোপাধ্যায়কে যেভাবে দেখেছি এবং পেয়েছি ,তার কিছু কিছু টুকরো ঘটনা এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করছি।

তিনি তখন ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেলের জেনারেল ম্যানেজার (হেড কোয়ার্টার) হিসাবে কাজ পরিচালনা করছেন। সম্ভবত ২০০১-২০০২ সাল হবে। ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেলের প্রধান কর্মচারী সংগঠন বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে শিশির রায় এর উপর। তাই কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝেই যেতে হত আধিকারিকদের নিকট।

কিছুদিন ধরে কয়েকজন ক্যান্টিন ক্যাজুয়াল কর্মী ইউনিয়ন অফিসে এসে বলতে লাগল, “শিশিরদা আমরা অনেক বছর যাবত ক্যান্টিনে কাজ করছি, কিন্তু বিভাগীয় কর্মচারীর স্বীকৃতি পাচ্ছি না। অথচ আমাদের পরে যারা কাজ শুরু করে ছিল, তারা কিন্তু নিয়মিত কর্মচারীর স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। আমাদের জন্য কিছু একটা করুন যাতে আমরাও বিভাগীয় কর্মীর স্বীকৃতি পাই।” মনে পরল সেই মানুষটির কথা যিনি যেকোন কঠিন সমস্যার সমাধান বের করার চেষ্টা করেন, তিনিই সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়।

ওদের কেসগুলো নিজে ভালো করে স্টাডি করলাম। দেখলাম রেগুলারাইজেশন এর মেরিট আছে। তারপর সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গেলাম এবং ওনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। আলোচনার পর উনি বললেন, “শিশির, ওদের কেসের মেরিট আছে, ওদের বিভাগীয় করার দায়িত্ব আমার।” দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সেই দশজন ক্যান্টিন ক্যাসুয়াল কর্মী বিভাগীয় কর্মীর স্বীকৃতি পেয়েছিল। অথচ এর আগে অন্য সিনিয়র

আধিকারিকরা বাতিল করে দিয়েছিলেন এই বিভাগীয় করনের দাবি, কারন এই কর্মচারীরা কোন এক সময় আদালতে গিয়েছিল বিভাগীয় করনের এই দাবি নিয়ে, কিন্তু আদালত তাদের আবেদন গ্রহন করেনি। আবার আদালত একথাও বলেনি যে এদের বিভাগীয় করন করা যাবে না।এই পয়েন্টটাকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে চিফ জেনারেল ম্যানেজার সারদা প্রসাদ চক্রবর্তীর সঙ্গে জেনারেল ম্যানেজার সুদীপ্ত চট্টোপোধ্যায়ের বিভাগীয় আইনি লড়াইয়ের কথা মনে পরে। এখানেই তিনি অনন্য।

আর একটি ঘটনায় আসা যাক, আমাদের এক সহকর্মী (চন্দনা গাঙ্গুলি) বৈষ্ণবঘাটা টেলিকম কোয়ার্টারে থাকতেন। মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে অফিসে না এসে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন। ঐ আবাসনের সম্পাদক আমাকে বললেন “ঐ ভদ্রমহিলার কোন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নেই যে তার রোগের চিকিৎসা করাতে পারে। শিশিরদা আপনি কিছু একটা করুন যাতে উনি সুস্থ হয়ে আবার অফিস করতে পারে।”

কয়েকদিন ধরে ভেবে পাচ্ছিলাম না যে কি করা উচিত। হঠাৎ সুদীপ্ত চট্টাপাধ্যায়ের কথা মনে পরল। চেম্বারে গিয়ে বসলাম এবং পুরো ঘটনাটা ব্যাখ্যা করে বললাম।এক্ষেত্রে কী করা যায় তাঁর পরামর্শ চাইলাম। খানিকক্ষণ ভেবে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা শিশির, বিএসএনএল এর ওয়েলফেয়ার সেকশনের কাজ কী?" উত্তরে জানালাম অবশ্যই কর্মচারীদের ওয়েলফেয়ারের কাজ করা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওয়েলফেয়ার অফিসারকে ডেকে পাঠালেন। আসার সাথে সাথে তাকে নির্দেশ দিলেন, যতদ্রুত সম্ভব কোনো মানসিক হসপিটালে সেই মানসিক রুগিনীকে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।শুধু এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও নির্দেশ দিলেন যে একটা ক্যাশলেস মানসিক হাসপাতালের সঙ্গে বিএসএনএল এর চুক্তি করতে হবে, যেখানে বিএসএনএল এর এই ধরনের অসুস্থ মানুষ ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করাতে পারে। সেই সহকর্মী সুস্থ হয়ে অফিসে আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ইনি হচ্ছেন মানবিক মানুষ সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়।

টেলিকম শিল্প বিএসএনএল, ক্যালকাটা টেলিফোনস এর কর্মীরা অত্যন্ত সচেতন এবং সাংস্কৃতিক মনের মানুষ। একটা সময় ছিল ক্যালকাটা টেলিফোনসে যখন ৪১ টা টেলিকম রিক্রিয়েশন ক্লাব ছিল।নাটক, সঙ্গীত পরিবেশনা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মসূচী নিয়মিত প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হত।

গোটা দুনিয়াব্যাপী প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় ৮ই মার্চ। আমাদের প্রিয় সংগঠন বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন এই দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করে। বিভিন্ন কর্মসূচীর পাশাপাশি আলোচনাসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর ট্রেড ইউনিয়ন বা শিক্ষাজগতের কোন প্রতিষ্ঠিত মানুষ এই আলোচনা সভার প্রধান বক্তা হয়ে থাকেন।

সেবার সংগঠনের আলোচনাসভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রীতা চট্টোপাধ্যায়ের নাম উঠে এলো। জানা গেল তিনি সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। তাই ওনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললাম। উনি বললেন, "শিশির আপনি আপনার বউদির(অধ্যাপিকা রীতা চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে ফোনে কথা বলুন।"

অধ্যাপিকা রীতা চট্টোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বক্তা হতে রাজি হলেন। ক্যালকাটা টেলিফোনস সার্কেল ইউনিয়নে তাঁর তথ্য সমৃদ্ধ সাবলীল বক্তৃতা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

১৯৯১ সালে ভারতে নয়া উদার অর্থনৈতিকনীতি চালু হয়। সরকারী দপ্তরে নিয়মিত কর্মী নিয়োগ বন্ধ।কিন্তু কাজের জন্য লোক দরকার।নতুন এক শ্রেনীর কর্মী জন্ম নিল টেলিকম শিল্প বিএসএনএল এ, নাম ঠিকা মজদুর। তাদের না আছে ন্যূনতম বেতন,না আছে সামাজিক সুরক্ষা।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবি উত্থাপন করা হল নূন্যতম মজুরী, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি । জেনারেল ম্যানেজার সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করে এ ব্যাপারে তাদের প্রস্তাব জানতে চাইলেন। হাই পাওয়ার কমিটির সুপারিশ ন্যূনতম মজুরী এবং সামাজিক সুরক্ষা ইপিএফ/ইএসআই চালু করা হল।

আরও একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁকে।বিভাগীয় কর্মীরা বোনাস পেত। কিন্তু ঠিকা কর্মীদের কোন উৎসব ভাতা ছিল না। এই দাবি নিয়ে ম্যানেজমেন্ট এর কাছে যাওয়া হল। চট্টোপাধ্যায় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,"শিশির, ঠিকা কর্মীর আবার বোনাস? সেটা আবার হয় নাকি? কি নামে দেবে ঠিক করুক ম্যানেজমেন্ট।ওদের জন্য আপনাকে কিছু একটা করতে হবে যাতে বিভাগীয় কর্মীদের সঙ্গে ওরাও উৎসব ভাতা পেতে পারে।" হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করে ঠিকা কর্মীদের জন্য বোনাস চালু করলেন। নাম দেওয়া হল ফাইনানসিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট।এখানেই সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় অন্যদের থেকে আলাদা।

২০০৩ সালে সৌম্যনেত্রার বিয়েতে অনেকের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় নেতা বিজয় গোস্বামী এবং শিশির রায় অর্থাৎ আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। চট্টোপাধ্যায় সাহেব বিজয় গোস্বামীকে সৌম্যনেত্রার সঙ্গে আলাপ করাতে গিয়ে বললেন, “ইনি বিজয় গোস্বামী ,আমার পিতৃসম।”একজন সিনিয়র ট্রেড ইউনিয়ন নেতার প্রতি কতটা শ্রদ্ধা থাকলে এটা সম্ভব সেটা সেদিন তাঁর কথায় বুঝেছিলাম।

২০০৫ সাল। টেলিফোন ভবন সেকেন্ড ফ্লোর করিডোরে হঠাৎ চট্টোপাধ্যায় সাহেব এর সঙ্গে দেখা। "কি ব্যাপার শিশির, আপনার এমন কি ব্যস্ততা যে আপনি আমার কাছে কিছুদিন ধরে আসছেন না?" উত্তরে জানালাম, "আমি সংগঠনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছি, তাই আপনার কাছে যাওয়ার দরকার পড়েনা।" উনি সঙ্গে সঙ্গে সেদিন যে কথা বলেছিলেন সেটা হল, "আমি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শিশির রায়কে বলছি না,আমি মানুষ শিশির রায়কে বলছি, মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, তার সঙ্গে কথা বলাটাও কাজের মধ্যে পরে"।

তিনি আরও বললেন, "আপনার আমাকে প্রয়োজন আছে কীনা জানি না, আপনার সঙ্গে আমার প্রয়োজন আছে। আপনি সময় পেলে আমার কাছে আসবেন।”

ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পরেছে। মুম্বাইয়ে চিকিৎসা করাতে গেলেন। কেমো থেরাপির পর কোলকাতার রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরে আসার পর আমি, মনিষা বিশ্বাস এবং প্রদ্যুৎ মজুমদার তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। দুটি কথা আজও মনে আছে। "চিনে আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো? তা গেটে কী বললেন? কালো ভদ্রলোকের সুন্দরী ফর্সা বউয়ের বাড়িটা কোথায়?” দ্বিতীয় কথাটা ছিল "শিশির, অ্যানাটমি পড়াতে হলে কঙ্কালের দরকার নেই। আমাকে দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারবেন”। ঘটনাটা হল কেমোথেরাপির পর চুল উঠে গিয়েছিল, ভীষণ রকম ওজন কমে যাওয়ার কারণে চেহারা খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল। আমরা খুব কষ্ট পেয়েছিলাম ওনাকে ওই অবস্থায় দেখে। একটা মন খারাপ করা পরিবেশ, ঐ পরিবেশটা তাঁর কথায় স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সেদিন আমি একজন রসিক মানুষ সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় কে খুঁজে পেয়েছিলাম।

তার মৃত্যুর দুদিন আগে খবর পেলাম তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। নার্সিংহোমে গিয়ে তাঁকে দেখে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। গলায় একটা অপারেশন করে সেখান থেকে রাইস টিউবের সাহায্যে খাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে।কথা বলতে পারছিলেন না।আমি গিয়ে বেডের কাছে দাঁড়ালাম, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পরল। রীতা বউদির কাছে ইশারা করে একটা কাগজ কলম চাইলেন। তিনি কাগজে লিখলেন, "শিশির আমি আর বাঁচব না, আমার মৃত্যুর পর আপনার বউদির ফ্যামিলি পেনশন যাতে তাড়াতাড়ি চালু হয় সেটা একটু দেখবেন।” কিছুক্ষনের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। একজন আইটিএস অফিসার, একটা প্রতিষ্ঠান এর সর্বোচ্চ পদাধিকারী, যার সহকর্মী অনেক বড়ো বড়ো আধিকারিক, তিনি আমার মত অতি সাধারন একজন

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে মৃত্যুর প্রাক্কালে ঐ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য দেখা করতে চাইলেন। একজন মানুষকে কতটা বিশ্বাস, কতটা ভরসা করলে এটা সম্ভব, সেদিন বুঝেছিলাম।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব তখন আপেক্ষিকভাবে কিছুটা নিয়ন্ত্রনে, রীতা বউদি হঠাৎ একদিন ফোন করলেন। জানালেন যে তিনি ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি আরও বললেন যে তাঁর এবং সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটা অ্যাকাডেমি তৈরী করেছেন। সেই বিষয়ে একটি আলোচনাসভা তথা সেমিনার করতে চান।ইচ্ছে ছিল কোন একটি প্রেক্ষাগৃহে করার, কিন্তু কোভিড-১৯ এর প্রতিবন্ধকতার কারণে অনলাইনে ডিজিটাল মাধ্যম মারফৎ করা হবে। "শিশির আপনাকে অংশ নিতে হবে"। তৎক্ষণাৎ আমি রাজি হয়ে গেলাম এবং অনবদ্য একটি সেমিনার উপভোগ করার সুযোগ হয়েছিল।

এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে স্মৃতির পাতায়। আজও কর্মক্ষেত্রে যখনই কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হই, তখনই সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি ভীষণ ভাবে অনুভব করি। মানুষ মরণশীল। তবে সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় সময়ের অনেক আগেই চলে গেলেন। তিনি এবং রীতাদি বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন, তাঁদের কাজের মধ্যে দিয়ে। এখানেই তাঁদের অমরত্ব।।

(শিশির কুমার রায় পেশায় চাকুরীরত, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (টেলিকম সার্ভিস), ক্যালকাটা টেলিফোন ডিস্ট্রিক্ট, ভারত সন্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)।
নেশায় তিনি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী (ছিলেন সভাপতি, ক্যালকাটা টেলিফোন ডিস্ট্রিক্ট, সর্বভারতীয় সহ সাধারন সম্পাদক (এজিএস), সেন্ট্রাল হেড কোয়ার্টার (সিএইচকিউ), নিউ দিল্লি, ইউনিয়নের নাম বিএসএনএল এম্প্লয়িজ ইউনিয়ন) এবং সহ সাধারন সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ (২০০৫-২০১২)।)

ঋতাদিকে স্মরণ

স্বাতী পারেখ

গতকাল ছিল ঋতা চট্টোপাধ্যায় এর স্মরণ সভা, আয়োজক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ। যদিও আমি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নই, আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও নই,তবু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবার এসেছি, এসেছি সংস্কৃত বিভাগে,ঋতাদির আমন্ত্রণে। যখনি কোন সেমিনার, কনফারেন্সের আয়োজন করেছেন,নামী -দামী বিদ্বান পন্ডিত ব্যক্তিদের বক্তৃতার আয়োজন হয়েছে তখনি আমাকে ডেকেছেন শ্রোতা হিসেবে। সংস্কৃত নিয়ে পড়লেও আমার কর্মজীবন ভিন্ন, আমি বি এস এন এলের কর্মী, যেখানে আমার পঠিত বিষয়ের প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। আমি যাতে পড়াশুনার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন না হই তার জন্য ঋতাদি আমাকে উৎসাহ দিয়ে চলতেন। শুধু ঋতাদি নয় , সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় যিনি ছিলেন ঋতাদির যথাযোগ্য জীবনসঙ্গী,ক্যালকাটা টেলিফোন্সের উচ্চতম আধিকারিক তিনি ও আমাকে কেজো জগতের বাইরে সারস্বত জগতের মধ্যে যাতে থাকতে পারি তার পরামর্শ দিতেন। দুঃখ হয় ওঁনাদের উৎসাহের সেরকম মূল্য দিতে পারলাম না। আসলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সকলের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা দেখতেন, প্রত্যেককে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করতেন, শুধু মাত্র মুখের কথায় নয়, কাজে ও ব্যবহারে তার পরিচয় রেখেছেন।

গতকাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে ঋতাদির স্মরণসভায় গিয়ে আরো উপলব্ধি হল যে তিনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাস্তবিক প্রয়াস দেখাতেন। ছাত্রছাত্রীদের কথায় উঠে এসেছে কি ভাবে তিনি তাদের উত্তরণের চেষ্টা করতেন, উচ্চ শিক্ষা লাভে, গবেষণামূলক কাজে যোগ দিতে, দেশে-বিদেশে নিজেদের কে ছড়িয়ে দিতে যত্ন নিতেন। নানাভাবে, সক্রিয় চেষ্টার মাধ্যমে ছাত্রদের সহযোগিতা করতেন।বই দিয়ে,বই এর সন্ধান দিয়ে, নিজের অধীত জ্ঞান দিয়ে , অভিজ্ঞতা দিয়ে ছাত্রদের সহযোগিতা করতেন। সব থেকে বড় কথা ওঁনার স্নেহপ্রবণ মন দিয়ে ছাত্রদের মঙ্গল করতেন। ফলে শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে একটা দৃঢ় বন্ধন গড়ে উঠত।ক্লাসের কয়েক ঘন্টা নিয়মমাফিক পড়ানোর মধ্যে ই সীমাবদ্ধ থাকত না। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ওঁনার

সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের কাছে ঋতাদির স্নিগ্ধ ও কোমল ব্যক্তিত্ব এবং অগাধ পান্ডিত্যের স্মৃতি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ঋতাদি র জন্য আয়োজিত স্মরণ সভায় বসে আমার খুব মনে পড়ছিল ঋতাদির আয়োজিত সেমিনার গুলোর কথা। ঋতাদি নিজে যেমন সর্বদা সুন্দর থাকতেন, তাঁর প্রতিটা কাজই থাকত সুন্দর ও নিখুঁত। যে সব বক্তৃতা সভায় গিয়েছি, দেখেছি সভা সুষ্ঠু ও সুন্দর করার জন্য সহযোগিদের নিয়ে ঋতাদির কর্মকান্ড। ঋতাদির ব্যক্তিত্বে এমন এক মাধুর্য আছে আর বাচনভঙ্গির মিষ্টত্ব ও বিষয়বস্তুর ওপর আশ্চর্য দখল আছে যে দর্শক ও শ্রোতৃমন্ডল মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। ঋতাদির বক্তৃতার অদ্ভুদ এক আকর্ষণীয় ক্ষমতা ছিল। তাই ভাবছিলাম ঋতাদির ছবির দিকে তাকিয়ে ,আজ তিনি শুধু নির্বাক ছবি,আজ তার ব্যক্তিত্ব , বাচনভঙ্গি ভবিষ্যতে র প্রজন্মের কাছে উদাহরণস্বরূপ রয়ে গেল।

যদি সত্যিই মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে, যদি প্রয়াত মানুষ দেখতে পারেন তাহলে ঋতাদি খুব আনন্দিত হবেন যে উঁনার সহকর্মী,সহযোগী, ছাত্রছাত্রীরা কত সুন্দর ভাবে উঁনাকে স্মরণ করলেন।বিশেষ করে যে সব ছাত্র ছাত্রীরা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন , অতুলনীয়। খালি গলায় কী দরদ, কী সুরে গাইলেন। ঋতাদির প্রতি তাদের আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা তাদের প্রতিটি বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে হচ্ছে ঋতাদি সবসময় সব মানুষকে, বিশেষ করে ভাল মনের মানুষকে মূল্য দিতেন। উঁনার কথায়,"জানিস আমি ভাল মানুষ দের নিয়ে আমার কনভারজেন্স প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কার কত ডিগ্রি আছে, জ্ঞানের খ্যাতি আছে ,তা দেখব না, দেখব তার কত বড় মন আছে, আছে একনিষ্ঠতা"। অনেক বড় স্বপ্ন ঋতাদির তাঁর Convergence নিয়ে। শুধু মাত্র জন্ম দিলেন, সে এখন একেবারে আঁতুড় ঘরে। জানি না তার ভবিষৎ কি? একটা সংশয় থেকেই গেছে। শুরুতে Convergence নিয়ে সকলের যে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং ঋতাদির পাশে থাকার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, কিছুদিন পরেই আমার অনুভূতি হল সেই উৎসাহে যেন ভাঁটা পড়েছে। অবশ্য ই একটা বড় কারণ

সাম্প্রতিক করোনার আবির্ভাব। তারপর তো ঋতাদি এত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে হাসপাতালে ICU তে থাকতে বাধ্য হলেন। যেদিন বেশি অসুস্থ হলেন তার দুদিন আগে কনভারজেন্সের শেষ মিটিং এ তিনি খানিক উত্তেজিত ছিলেন, ঋতাদিকে কোনদিন এত উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে শুনিনি,সর্বদা ধীর স্থির।মনে হয় কনভারজেন্স নিয়ে উনি চিন্তিত ছিলেন যার প্রভাব ওঁনার শরীরে পড়েছিল।

ঋতাদি অগ্রজদের এবং গুণী মানুষদের খুব সম্মান করতেন। হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ,সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, রমা চৌধুরী, ওঁনাদের নিয়ে কাজ করেছেন, শুধু মাত্র পুঁথিগত তথ্যের উপর নির্ভর করে নয়, বাড়ি গিয়ে, ওঁনাদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে, অনেক পরিশ্রম ও পড়াশুনা করে উনি এক একটা মূল্যবান কাজ করেছেন। যাঁর কাছে যতটুকু পেয়েছেন, সে তিনি নামী মানুষ হোক কিংবা সাধারণ মানুষ, সেই প্রাপ্তির তিনি স্বীকার করেছেন, এটা মনুষত্বের এক বড় পরিচয়। শুধু দেবতাকে ফল-ফুল ধূপ দিয়ে পুজো করলেই হয় না, মানুষের মধ্যেই দেবতার বাস, সেই মানুষ রূপী দেবতাকে মূল্য দিতে সবাই পারে না, যে পারে সেই তো প্রকৃত মানুষ। ঋতাদি তাই প্রকৃত মানুষের দলেই পরে। তাঁর কাছে এই শিক্ষাই যেন পাই প্রতিটা মানুষ যেন তার মনুষত্বের স্বীকৃতি পায়, কেউ অবহেলার নয়। কারুর উপকার না করতে পারি কদাপি কারুর অপকার যেন না করা হয় ।

এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই ঋতাদির মতোই ওঁনারা যে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার জন্য। ঋতাদির আদর্শ যেন স়ংস্কৃত বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের আদর্শ হয় এই ইচ্ছা প্রকাশ করি। মানুষ তো কালের নিয়মে চলে যাবেই, যা থেকে যাবে তাঁর কীর্তি আর তাঁর ব্যবহার। ঋতাদির কৃত কর্মকান্ড,তাঁর রচিত গ্রন্থ ই তাঁকে অমরত্ব দেবে। ঋতাদিকে আমার শ্রদ্ধা আর প্রণাম জানালাম।

(স্বাতী পারেখ সংস্কৃত কলেজ থেকে বি এ পাশ করে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ, এম ফিল আর জার্মানে দুই বছরের ডিপ্লোমা করেছেন । ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডে (বি এস এন এল) এর কর্মী। অফিসের হিন্দি ও বাংলা পত্রিকায় এবং মাসকাবারি পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন।)

আমার দেখা এক অনন্যা নারী

ইষিতা রায়

“অনেকজন্মসম্প্রাপ্ত কর্মেন্ধনবিদাহিনে

আত্মজ্ঞানাগ্নিদানেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।”

গুরুর অধিক তপস্যা নেই।গুরু আদি,অনাদি ও পরম দেবতা।বহু বহু জন্মের কর্মরূপ কাষ্ঠকে আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা যিনি দগ্ধ করেন,সেই গুরুকে প্রণাম জানাই।

আমি যাঁকে গুরু হিসাবে পেয়েছিলাম তিনি পান্ডিত্যে সমুদ্রতুল্য।যাঁর পান্ডিত্যের গভীরতা নিয়ে বলার ধৃষ্টতা আমি দেখাতে পারব না।ব্যক্তি ঋতাদি আমার হৃদয়ে এক দেবীর আসন করে নিয়েছিলেন।

আমি উচ্চমাধ্যমিক পাস করে বাগবাজার উইমেন্স কলেজে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম 1990 সালে। তখন অনার্সের কাব্যের ক্লাস নিতেন ঋতাদি।তাঁর পড়ানোর দক্ষতায় পাঠ্যবিষয়গুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। বহুবার কলেজের শেষে আমি তাঁর বাড়ি গেছি।তিনি সাগ্রহে আমায় পড়া বুঝিয়েছেন।কলেজজীবনে তাঁর মতো একজন স্নেহশীলা শিক্ষিকার সান্নিধ্য আমি পেয়েছি।এতো গেল দিদির অধ্যাপনার ক্ষেত্র,শিক্ষাদানের ক্ষেত্র।

তিনি আমার জীবনে নানারূপে নানাভাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।কখনও philosopher হয়ে,কখনও বন্ধু হয়ে আমার জীবনের কঠিন সমস্যার সমাধান করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন।বলা হয়,"A good teacher is like a candle,it consumes itself,to light the way for others." তিনি তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে আমার পথ আলোকিত করেছেন।তাঁর সাহচর্য আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।

মানুষ ঋতাদিকে আমি অনেক কাছ থেকে দেখেছি।তাঁর অমায়িক ব্যবহার,তাঁর বাচনভঙ্গি আমাকে সবসময় মুগ্ধ করেছে।একজন শিক্ষক তখনই ছাত্রের কাছে প্রিয় হন যখন তিনি তার দুর্বল জায়গটা উপলব্ধি করেন। আমার ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটেছিল।স্নেহশীলা মায়ের মত আমাকে এগিয়ে চলার উপদেশ দিয়েছেন।প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্যবিচ্যুতি না ঘটিয়ে সামনের পথে হাঁটতে শিখিয়েছেন।

অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি "Convergence"নামে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়ে গেলেন তা শিক্ষনীয়।তাঁর এই প্রচেষ্টা যেন সম্মান পায় ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা।

আত্মা জন্ম ও মৃত্যুরহিত,অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূন্য, শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।

ঋতাদি তাঁর অসংখ্য কাজের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে বিরাজমান থাকবেন।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাsভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোsয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।"।

(ইষিতা রায়, সংস্কৃত-এ M.A., এবং স্কুল-এ শিক্ষকতা করেন|)

ভালো থাকুন ঋতাদি

রঞ্জিত দাস

স্মৃতি যেন বারবার ফিরে আসে আবিরাম ঢেউয়ের মতো ,

ভেঙে পড়ে হৃদয়ে ।

মনে পড়ে ঋতাদি , শৈশব থেকে বেড়ে ওঠা কার্ত্তিক বোস লেনের সেই বাড়িটার কথা ?

প্রকাণ্ড সেই বাড়িটাতে একসাথে লুকোচুরি , এক্কাদোক্কা ,লেম-ম্যান, ' কানামাছি- ভোঁ – ভোঁ ' খেলার কথা –

মাত্র ছমাসের বড় ছিলেন , তবুও কি অপত্য- স্নেহ ও স্নিগ্ধতায় এই ছোট ভাইটাকে আগলে রাখতেন –

বাড়ি – ওলা – ভাড়াটে মেশানো সকলকে দেখতেন একান্নবর্তী পারিবারের চোখে ।

আমার নিদারুন দুঃখের দিনে যখন চোখে জল এসে যেত , তখন দেখেছি আপনার চোখেও জল ।

মনে পড়ে ঋতাদি , বিশ্বকর্মা পুজোর দিন,

আমাদের ছাদ থেকে ঘুড়ি কাটা হলে সমস্বরে 'ভোঁ –কাটা ' বলে চীৎকার আর কাঁসর ঘণ্টা বাজানো ।

সবাইকে শোনাতে উচ্চস্বরে গান গাওয়া ।

জোর তর্কের আসর - কে বড় গায়ক - হেমান্ত মুখারজি না মান্না দে –

কে বড় অভিনেতা - উত্তমকুমার না সৌমিত্র চ্যাটারজি –

আমি আর আপনি ছিলাম উত্তমকুমারের দলে ।

দেখেছি নিরলস অধ্যবসায় - কি বিদ্যার্জনে - কি সংগীত শিক্ষায় ,

যেখানেই বিচরণ করেছেন সর্বত্রই দাঁড়িয়েছেন প্রথম সারিতে ।

আপনার পান্ডিত্যের বিশালতা আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের বোধগম্য নয় – চিন্তা করাও বাতুলতা ।

শুধু জানি যে সাধানায় আপনি ব্রতী হয়েছিলেন ,

তা আপনি সম্পূর্ণ করে গেছেন ।

WOOD CUT – চেহারার সুদিপ্তদার সাথে আপনার দেখা হয়ছে কি ?

বলবেন সেই সদা হাস্যময় মুখটি আজও এই ছোট ভাইয়ের হৃদয়ে অমলিন ।

তারই দেওয়া JAIPURIA কলেজের ফিজিক্সের নোট নিয়ে ,

VIDYASAGAR কলেজ থেকে ফিজিক্স অনার্স করেছিলাম ।

মনে আছে কি – আপনাদের পরিচয়ের একটা পর্বে , কার্ত্তিক বোস লেন থেকে চিঠি

আমার পকেটে , ডালিমতলা লেনের ছোট গেট দিয়ে বিদ্যাসাগর আবাসনে পৌঁছে যেত ?

সে স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে অমলিন ।

স্মৃতির এই ঢেউয়ের মুখে দাঁড়িয়ে কখনো স্থবির হয়ে যাই ।

ঊর্দ্ধ পানে চেয়ে বিষণ্নতা গ্রাস করে,

কেমন যেন অসহায় মনে হয় ।

তবু নতমস্তকে গ্রহণ করি মহাকালের এই আদেশ ।

আবার দেখা হবে ঋতাদি,

জানিনা সে কোন শহরে – বা কোন দেশে ।

চিনে নেব ঠিক – আর পেয়ে যাব সেই অপত্য- স্নেহ আর সদা হাস্যময় মুখ ।

ততদিন ভালো থাকুন ঋতাদি । ।

(Background of the write-up: Dr. Rita Chatterjee (then Rita Biswas) and Ranjit Das grew up in the ancestral house of Rita Biswas located in Kartick Bose Lane in Hatibagan area of north Kolkata. Ranjit Das's father was a tenant in that house along with other tenants, and he stayed there from school to college days.

The above rendering depicted only a few memories of the author as they grew up from childhood and the intense love and affection bestowed by Ritadi for his younger brother. Some of the other places indicated above are as follows:

Dalimtala Lane – The big ancestral house started from Kartick Bose lane and ended in another adjacent lane known as Dalimtala Lane. In the rear side of the house a small gate was there for easier approach of this lane.

Vidyasagar Abasan - Where Sudipto Chatterjee used to stay along with his parents very near to Dalimtala Lane.

(Ranjit Das had his B.Tech Degree in Applied Physics from Science College, University of Kolkata in 1975. He retired from Schneider Electric Co. in 2011 and works as freelance Electrical consultant in his spare time.)

আমার স্মৃতিতে মাসীমা

সিদ্ধার্থ

আমার জীবনে দেখা এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যিনি রূপে মা জগদ্ধাত্রী ও গুণে মা সরস্বতীর মতন। তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মাসীমা, আমার প্রিয় বন্ধু সৌম্যনেত্রার মা, অধ্যাপিকা শ্রীমতী ঋতা চট্টোপাধ্যায়।

মাসীমার সাথে আমার প্রথম দেখা তার নিউটাউনের ফ্ল্যাটে। সম্ভবত সেটা ২০১৯ সালের মে মাসের কোন একটা ছুটির দিনে। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে ওনার ফ্ল্যাটে সৌম্যনেত্রার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এইখানে বলে রাখি সৌম্যনেত্রার মেয়ে ও আমার মেয়ে লোরেটো হাউসে একই ক্লাসের ছাত্রী এবং সেই সূত্রেই সৌম্যনেত্রার সাথে আমার পরিচয়।

আজও আমার মনে আছে সেই বিশেষ দিনটির কথা। সেইদিন সৌম্যনেত্রা মাসীমার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। কিছুক্ষণের আলাপচারিতায় মাসীমা তার ব্যবহারে আমায় আপন করে নিলেন। আমার মনে হচ্ছিল আমি তার বহুদিনের পরিচিত। সারা সন্ধ্যেটা সেখানে কাটিয়েছিলাম। নানা কথোপকথনে তার বহুমুখী প্রতিভা এক এক করে জানতে শুরু করলাম। আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম তার আন্তরিক ব্যবহারে।

এরপর বেশ কয়েকবার ওনার সান্নিধ্যে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। একবার তিনি তার পরিচালনায় কালিদাসের মেঘদূতম্ নৃত্যনাট্যে আমার মেয়ে ও সৌম্যনেত্রার মেয়েকে অর্থাৎ তার নাতনীকে নৃত্য পরিবেশনের সুযোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে সৌম্যনেত্রা মুখ্য ভূমিকায় নৃত্য পরিবেশন করেছিল। সৌম্যনেত্রাও অসাধারণ নৃত্যে পারদর্শি। সৌম্যনেত্রাকে দেখে মনে হয় মাসীমা ঠিক ওনার মতন করে ওকে তৈরী করেছেন। অত্যন্ত মার্জিত, উচ্চ শিক্ষিতা ও প্রতিভা সম্পন্না, যা মাসীমার দেওয়া সমাজকে এক মূল্যবান উপহার। মাসীমার পরিচালিত নাটক আমার দুবার দেখার সুযোগ

হয়েছে। ওনার অনুষ্ঠান থাকলে আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করতেন। আমিও চেষ্টা করতাম ওনার অনুরোধ রাখতে। ধীরে ধীরে আমার অজান্তে ওনার স্নেহময়ী ব্যবহারে ওনাদের পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। আমার মনে আছে একদিন তিনি বলেছিলেন, "সিদ্ধার্থ, তুমি পূর্বজন্মে আমরা পরিজন ছিলে।"

এরপর বেশ কয়েকবার ওনার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল। তার নিউটাউনের নিজস্ব বাসভবনের গৃহপ্রবেশেও আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার প্রতি ওনার এই স্নেহ মমতায় আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

মাসীমার সাথে আমার শেষ দেখা ২০২২ সালের মে মাসে তার নাতনীর জন্মদিনে। সেইদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে মেয়েকে নিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, মাসীমার সাথে অনেক কথা হয়েছিল। কথার মাঝে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সিদ্ধার্থ তোমায় বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে?" আমার উত্তর ছিল, "অফিস থেকে ফিরেছি তাই ক্লান্ত দেখাচ্ছে, আমার শরীর ভালোই আছে।" সেদিন বুঝেছিলাম তিনি আমায় কতটা স্নেহ করতেন। বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার পর ওনাকে হাত ধরে নীচে নিয়ে আসি খাওয়া দাওয়ার জায়গায়। সব অতিথিদের নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে বাড়ি ফেরার সময় একবারও মনে হয়নি যে, মাসীমার সাথে সেইদিনই শেষ দেখা।

হঠাৎ একদিন শুনলাম ওনাকে অ্যাপেলো হসপিটালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। সৌম্যনেত্রার সাথে সেই মুহূর্তে যোগাযোগ করে মাসীমার শারীরিক অবস্থা বিষদভাবে জানতে পারি। চিকিৎসকরা অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। সৌম্যনেত্রা কলকাতার উন্নত হসপিটালের উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারা মাসীমাকে ধরে রাখার অক্লান্ত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সব প্রচেষ্টার অবসান ঘটিয়ে মাসীমা ১২ই আগস্ট, ২০২২ ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেন। এই সংবাদ শোনার পর মনে হয়েছিল আমি আমার জীবনে দেখা এক অসাধারণ মমতাময়ী ও স্নেহপরায়ণ ব্যক্তিত্বকে হারালাম।

মাসীমার থেকে পাওয়া স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ যা আমি যত্নসহকারে আমার অন্তরে লালন করে রাখব। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন পরজন্মে আবার তাঁর সাক্ষাৎ পাই। আপনার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

(সিদ্ধার্থ মুখার্জী পেশায় চাকুরীরত, নেশায় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। তিনি ঋতা চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত প্রিয় ও কাছের মানুষ ছিলেন। যদিও তাদের আলাপের সূত্র হলো ঋতা চট্টোপাধ্যায়ের নাতনি আর সিদ্ধার্থর মেয়ে একই স্কুলএ এবং একই ক্লাসএ পড়ে। সিদ্ধার্থ তার নিজের আন্তরিকতায়, ঋতা চট্টোপাধ্যায়ের খুব ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।)

Rita Di: Eternal Symbol of Wisdom and Sacrifice

Arun Ranjan Mishra

I know Rita Di long since in a seminar at Pune University. I found her endowed with a clear heart whereupon the reflection of the Goddess Sarasvatī was very clear - प्रवर्तते हि विमले हृदि स्वच्छे सरस्वती।. This is the reason for which she was well-known in the circle of scholars. In fact, physical body is less important that the body of fame through which she exists eternally. Rightly says Kalidas-

अपि स्वदेहात् किमुतेन्द्रियार्थाद्
यशोधनानां हि यशो गरीयः॥ (रघु. १४/३५)

But despite her wide contact, she was sweet- spoken to all. This made her magnetic in the academia of Indology. As if her beaming face was always advising her tongue for giving solace and help to all-

हे जिह्वे! कटुकस्नेहे मधुरं किं न भाषसे?
मधुरं वद कल्याणि, लोकोऽयं मधुरप्रियः॥ (चाणक्यनीतिः ३/१३२)

Her assurances to her students were very much fruitful. Many of her students have been highly benefited by her. But she doesn't announce her munificence. She silently helped her worthy and needy students. She unannounced comes forth to people in need of help-

नीचो वदति न कुरुते, न वदति सुजनः करोत्येव॥

I have seen her smooth cooperation with her colleagues all over India. By this practice not only she benefited others, others also benefited her in many ways through a pleasing

reciprocation in the domain of knowledge and research. Seeing her co-operative in scholarly activities, we often remember a verse from Śāntiparva-

कश्चित्तरति काष्ठेन सुगभीरां महानदीम्।

स तारयति तत्काष्ठं स च काष्ठेन तार्यते।। (१३८/६२)

Prof. Rita Chattopadhyay dedicated herself to teaching and research for a pretty long time. Before she retired as Professor from Jadavpur University, Kolkata, she was awarded the position of Professor Emeritus by U.G.C. and continued her active work. She established an on-line institution named Convergence in 2022 which worked well in spreading knowledge of different languages, poetry, music, philosophy etc. through academicians. I had never dreamt that she would leave us all in the pretext of an ailment. After all what was her age? Her near and dear ones, students and well-wishers based in Kolkata saw her last and suffering days. I am now in deep remorse that I could not go from Santiniketan to see her. I had a wrong notion that she would recover. While expressing my condolence to her family I deeply apologise for this.

Rita Di will always be remembered for her good heart and her good number of works. Her scholarly penance will spread its sweet fragrance eternally in all directions –

यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूराद् गन्धो वाति,

एवं पुण्यस्य कर्मणो दूराद् गन्धो वाति ।। (तै. आरण्यक, १०/९)

(Arun Ranjan Mishra is currently Professor, Dept. of Sanskrit, Visva-Bharati, Santiniketan. He shared the same subject and research interests as Professor Rita Chattopadhyay and was academically very close to her. He even came forward teaching Oriya in one of the online courses of Convergence. Apart from being an outstanding academician, he has also authored several poetry books in Sanskrit.)

আমার অসমাপ্ত বই পড়া

সোমা বসু

“হৃদয়লতা নুয়ে পড়ে ব্যথাভরা ফুলের ভারে গো।

আমি যে আর বইতে পারি নে। আমি যে আর সইতে পারি নে ॥”

কত কষ্টসঞ্জাত এই বাণী ভুক্তভোগী না হলে অনুভব করা যায় না।

“কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।”

মনে হচ্ছে বড় আপন কাছের মানুষ যারা চিরবিদায় নিয়ে বহুদূরে চলে গেলো তাদের বিয়োগ ব্যথা বইবার বা সইবার শক্তি আর আসবে কি করে, কোথা থেকেই বা ?

যারা শক্তি যোগাতো সেই সব “বড় আপন কাছের মানুষ রইলো দূরে।” সহজ সুধা তো ছিলো তাদেরই সাহচর্যে।

“হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও দাও দাও না পূরে” -

এই জীবনে আর কি সে হবে, সে সব সন্ধ্যাও হবে না, সে সব মধুর সুখে জড়িত দিনও আর ফিরে আসবে না।

“আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে

আমি তোমার বাঁধন নেবো তুলে” বলার সাহস নেই। ঈশ্বর মঙ্গলময় কি করে বিশ্বাস করা যায় এরও পরে !

ঈশ্বর অবিশ্বাসীর সুবিধে এই যে তারা ঈশ্বরকে দোষ দিতে পারে না কোন কিছুর দায়ে।

অমৃতধামযাত্রী নির্বিঘ্নে পৌঁছাও অমৃতলোকে।

“জানো না রে অধ-ঊর্ধ্বে বাহির-অন্তরে ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়

তোলো আনত শির, ত্যজো রে ভয়ভার তোলো আনত শির, ত্যজো রে ভয়ভার

সতত সরলচিতে চাহো তাঁরি প্রেমমুখপানে”

তোমার যাওয়ার বেলার জয়ধ্বনি কানে নিয়ে চলো।ভোরের আকাশও নিশ্চয়ই রাঙা হয়েছিলো, তোমার পথ হয়েছিলো সুন্দর।

তোমার হয়ে এ প্রার্থনা করতেই পারি -

“আমার যাবার বেলাতে সবাই জয়ধ্বনি কর্।

ভোরের আকাশ রাঙা হল রে, আমার পথ হল সুন্দর॥

কী নিয়ে বা যাব সেথা   ওগো তোরা ভাবিস নে তা, শূন্য হাতেই চলব বহিয়ে

আমার ব্যাকুল অন্তর ॥

মালা প'রে যাব মিলনবেশে, আমার পথিকসজ্জা নয়।

বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে মনে রাখি নে সেই ভয়।

যাত্রা যখন হবে সারা উঠবে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,

পূরবীতে করুণ বাঁশরি দ্বারে বাজবে মধুর স্বর॥”

নবীন তনুলাভ করো -ঈশ্বরের চরণে এই প্রণতি।

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥”

জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করো রোগ জর্জরিত এ দেহ। জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করো

আমার অসমাপ্ত রয়ে গেলো বই পড়া -

প্রচণ্ড প্রিয় বইটা পড়া শেষ হয়ে গেলো। সবসময় পাশেই থাকতো সে বই, পড়বো মনে হলেই মন প্রচন্ড ভালো হয়ে যেতো, বার বার পড়তাম, বাকি রেখে রেখে পড়তাম, মনে হতো যেন না ফুরোয় পাতাগুলো, বেশ মোটা এক নয়ন-ভোলানো, প্রচুর রং-এ ভরপুর এক বই, বিষয়টাও পরম রমণীয়। একটা অপূর্ব সুন্দর জীবনের গল্পের বই।

“কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায় …”

আর এতো আমাদের সর্বার্থে সম্পূর্ণ এক ঋতাদি হারিয়ে গেলো। এর থেকে ধ্রুব সত্য আর নেই।

আমাদের এই বাকরুদ্ধ, অবশ অবস্থা কোনদিনও কাটবে না। যতদিন আমরা বাঁচবো ঐ না-পাওয়ার গভীর বেদনা সঙ্গে নিয়ে চলবো।

সেই ১৯৯০ সাল থেকে যাঁকে চিনি, যিনি আমাকে মিষ্টি একটা “হ্যাঁ রে সোমা” বলে ডাকতেন , যিনি ডাকলে আমি ‘হ্যাঁ’, আবার বারণ করলে চুপ হয়ে যেতাম , ওনার বলার, লেখার, সাজার, অত্যন্ত রুচিপূর্ণ শাড়ি-গয়না-সম্ভারের মুগ্ধ ভক্ত ছিলাম। মনে মনে কত প্রশংসা করতাম, নির্নিমেষে চেয়ে থাকতাম ওনার স্নিগ্ধ রূপের দিকে , কান পেতে শুনতাম ওনার বলা, ওনার অপূর্ব মিষ্টি গলায় গান গাওয়া। প্রিয় বইটা কত তাড়াতাড়ি পড়া শেষ হয়ে গেলো। হায় !

ভুলে গেছি কবে থেকে ছিলাম আমরা ভীষণ চেনা। ধীরে ধীরে স্নেহের সম্পর্কে পাক ধরেছে, আমি ঋতাদিকে ‘তুমি’ বললাম আর ঋতাদি আমাকে ‘তুই’ বললো।

———-

ঋতা চট্টোপাধ্যায় যেমন ছিলো বিদগ্ধ পণ্ডিত, বিদুষী, গভীর জ্ঞানী, মানুষ হিসেবে তেমনই ছিলো সহজ মনের, নদীর স্বচ্ছ জলের স্নিগ্ধতা আর শীতলতা ছিলো স্বভাবে, আচরণে আর সুমধুর ব্যবহারে।

সহজেই আমার কাছে ঋতাদি হয়েছিলো পরম স্নেহময়ী,আমার কল্যাণকামী দিদি।

আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিলো রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের প্রধানের কক্ষে, কারণ ঋতাদি তখন বিভাগের প্রধান আর আমি অতিথি শিক্ষক। ঘরে ঢুকলেই মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে কাছে ডাকতো, "হ্যাঁ রে, সব খবর ভালো তো" ! সারাদিনের বাকী পথচলা সকাল সকাল এমন এক স্নিগ্ধ কোমল সুরে বেঁধে দিতে ঋতাদিই পারতো।

তখন থাকতো শ্রীভূমিতে, অতি পরিপাটি সুন্দর রুচিপূর্ণভাবে সজ্জিত ফ্ল্যাটে পরম শান্তি আর স্নিগ্ধতা ছিলো ছড়ানো। একদিন নিয়ে গেলো সেখানে, কত আদর যত্ন করেছিলো আজও মনে পড়ে। একদিন পাশেই লেক টাউনে আমার ফ্ল্যাটেও চলে এল ভরদুপুর বেলা, একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে বলে। সেই অল্পবয়সে অতিথি শিক্ষকের কি করে উন্নতি হবে সেই ভেবে ডেকে ডেকে বেশী ক্লাস দিতো, পরীক্ষায় invigilation এর কাজেও ডাকতো যাতে অভিজ্ঞতাগুলো ভবিষ্যৎ শিক্ষকজীবনে আমার উপকারে লাগে।

স্নেহবিতরণের উৎস ছিলো ঋতাদি, একমাথা খোঁপায়, অপূর্ব সব শাড়িতে আর রুচিমাফিক গয়নায় অনন্যসাধারণ ঋতাদি। ঋতাদির সে চেহারা মনের মধ্যে গেঁথে আছে যা সঙ্গে থাকবে সবচেয়ে মূল্যবান স্মৃতি হয়ে।

সে সময়েই ঋতাদির স্বামী সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় কর্মসূত্রে থাকতেন উড়িষ্যায় সঙ্গে কন্যা সৌম্যনেত্রা, ঋতাদি নিজের কর্মক্ষেত্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকেও মাঝে মধ্যে স্বল্প, নাতিদীর্ঘ বা দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে উড়িষ্যায় যেতেন, সংসার ও কাজ সব নিখুঁত ভাবে সামলে কিভাবে চলা যায় তা ঋতাদির জীবনযাপন থেকে শেখার মত ছিলো। সৌম্যনেত্রার অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত School leaving examination এর ফল সেই সাক্ষ্যই দ্যায়, এমন গুণী বাবা মা'র সাহচর্য পাওয়া কথার মত কথা। কিন্তু বিধির নিষ্ঠুর টানে তার ছিঁড়ে গেলো ... ঋতাদির জীবনের বড় বিপর্যয়ের ঝড় উঠলো। তখন তার সে দিশেহারা অবস্থা নীরবে দেখেছি,

দেখেছি তার মানসিক স্থৈর্যের দৃঢ়তা, অন্তরের প্রচণ্ড ঝড় বাইরে দৃশ্যমান হতে দ্যায়নি, পরে পরেই নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো আর রক্তে শর্করার মাত্রাধিক্য সম্ভবতঃ তখন থেকেই শরীরে বীজ বপন করে।

ঋতাদি রবীন্দ্রভারতী থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পরেও সে ভালোবাসা জাগ্রত ও অটুট থাকে। মধ্যবর্তী সময়ে আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে ঋতাদির সঙ্গে কিছু বছরের জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে অবশ্য আবার সংযোগ স্থাপিত হয় আমারই ভাগ্যগুণে !

বেশ কিছুদিন ধরে ঋতাদির মুখে প্রায়ই শুনতাম শরীর ভালো না, সত্যি করেই মানতে ইচ্ছে করতো না। ভাবতাম, শরীরে কষ্ট হয় তাই বলে, আসলে কিছু নয় হয়তো। মানতে ইচ্ছে করতো না এই সজীব, প্রাণোচ্ছল হাসিতে ভরপুর মানুষটির শরীরে সত্যি করে কোন ব্যাধি লুকিয়ে আছে। প্রায়ই ফোনে কথা হতো, মোবাইলে মেসেজ লেখা হতো ...কিছুদিন আগে সেটা খুব বেশী হতে লাগলো যখন Convergence এর মত সর্বার্থে প্রকাণ্ড এক কর্মযজ্ঞের আরম্ভ করলো এবং ভাবতে অবাক লাগে সেই কর্মযজ্ঞে আমাকে সামিল করলো।

বইমেলায় বই প্রকাশের অনুষ্ঠানেও আমাকে আমন্ত্রণ জানালো, বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিলো, নিজের প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর পাশাপাশি আমার থেকে চেয়ে নিয়ে আমার প্রকাশিত গ্রন্থগুলোকেও স্থান দিলো। কি নিরহঙ্কার আত্মাভিমানহীন প্রকৃত অর্থে এক মানুষ। আর এত বছর পেরিয়ে এসে কি পরম স্নেহ প্রেমে খুব কাছে ডেকে নিয়েছিলো, নির্ভরশীলতার ছত্রছায়ায় রেখেছিলো, নিজের মনের ভারও হয়তো কিছুটা লাঘবের জন্য আমার ওপর বিশ্বাস করেছিলো। শুনেছি ঋতাদির কণ্ঠে বেদনার আঘাতে অভিমানের সুর, কত জনের থেকে আঘাত পেয়ে নিজেকে সরিয়ে নিতে হয়েছে তাই বুঝি আমার সরলতার মধ্যে নির্ভর করেছিলো। সারস্বত কর্মে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম, কতটুকু ঋতাদির সাহায্যে আসতে পেরেছিলাম জানি না কিন্তু ঋতাদি তার স্নেহের ভাণ্ডার উপুড় করে দিয়েছিল নিজগুণে আর দাক্ষিণ্যে সবটুকু পূর্ণ করেছিলো, ভবিষ্যৎ কর্মেও সঙ্গে রাখবে বলেছিলো।

আমি তো ছিলাম আর থাকবোও তোমার সঙ্গে ঋতাদি, বাড়ির কত কাছে এসে গেলে, ভেবেছিলাম এমন দিদির সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়তম হবে, কত কাজ করবো, তোমার সঙ্গে চলবো, আরও কাজ শিখবো, তোমার অতল কালো স্নেহে সিক্ত হবো। তুমি কত তাড়াতাড়ি সব কিছু উজাড় করে দিয়ে সুন্দর করে সজ্জিত করে পরের প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে চলে গেলে। কেন এত তাড়াতাড়ি?

তোমার জন্য রইলো আমার ফুল ভরা সব গাছ !

আত্মদীপ হও।

মেঘের মত নীলাভ বা শ্বেতশুভ্র আলোকস্পর্শে জুড়াক আমার নয়ন,

কতবার সেই স্পর্শে কেঁপেছে জীবনের বিস্তৃত চিত্রপটে আঁকা ঘটনাপ্রবাহ -

আমার চেতনায় জ্বলেছে আর নিবেছে নির্মল শুদ্ধ তারকাকণা,

কাছ থেকে বারংবার সরে সরে গেছে জীবনের ধ্রুবতারা।

কোনকিছু বলার অপেক্ষা ছিলো না -

অন্তরের সুগভীর গোপন কক্ষে বন্দী যত ভাবনার বিশুদ্ধতা

আকাশে তুলে মাথা বাকী জীবন কাটবে খোঁজার বেলা।

স্পর্শে পাবো না, কাছেও পাবো না আর তাকে

যে শুধু চলেছে পার হয়ে জগৎ ও জীবনের সব পারাপারের সীমায় ধরা দিগন্তের রেখা !

মন যেন মাথা কোটে অনন্ত অসীমের পায়ে -

যেখানে রেখেছ তাকে সঙ্গীতে মুগ্ধ করে রেখো দিনেরাতে,

সব বেদনা সে ভোলে যাতে

লাভ করে পরমা গতি !

———-

আমার কাজ হলো না সারা, পড়ে রইলো সব কাজ,আমার হৃদয় স্তব্ধ, ক্ষণিক হারালো ছন্দ …

বহুদিনের অপেক্ষার শেষে খবর তুমি গেছ অনেক দূরের দেশে,

সেই না ফেরারই দেশে - পথ ফুরোলো মাঝপথেতে এসে।

সেই তুমি সব গুছিয়ে রেখে শুরুর আগেই চলে গেলে না ফেরার ঐ দেশে।

তুমি করবে না আর গল্প , ভুললে তোমার মিষ্টি করে ডাকা।

তোমার ছুটি ফুরোবে না, আর কখনও ফিরবে না সেই টেবিল ঘিরে বসে থাকার কাজে।

সকাল সকাল তোমার কথা ভেবে হলো না আমার কোন কাজ।

তোমার জন্য দিলাম এই পুষ্পস্তবক।

“আর কি কখনও কবে এমন সন্ধ্যা হবে জনমের মত হায় হয়ে গেলো হারা …” ॥

(সোমা বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিষয়ে স্নাতকোত্তর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত। বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বেদবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের অধ্যাপক।

কয়েকটি গ্রন্থ রচয়িতা, প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিচর্চায় মনোযোগী, রবীন্দ্রসাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ, রবীন্দ্রসংগীত ও কবিতা জীবনে পুজোর মন্ত্র। বিদেশি সাহিত্য, বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অনুরাগী, ভ্রমণপিপাসু, বাংলা সংগীতের একনিষ্ঠ শ্রোতা, নাটকপ্রিয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও আবাল্য সহজ বিষণ্নতাবিজড়িত আবেগপ্রবণ এক প্রাণ।)

Rita di

Rita Bhattacharyya

Our Beloved Ritadi (Prof. Rita Chattterji) was known to me for almost 3 decades. In 1992 when I was working in Manuscript Library of Calcutta University as a Research Scholar then she used to come there to one of my mentors Dr.Mira Roy (an octogenerian and an astounding scholar of History of Science),then the Keeper of Manuscript Section.

After a few days that Manuscript Section of Calcutta University became Manuscript Resource Centre under the supervision of National Mission for Manuscript, New Delhi. Since those days we (Ritadi and me) become friends; her elegant look and sweet gesture always attracted me much. She always gave me affection as like for a younger sister and I also used to respect her like elder scholar (सारस्वताग्रजा).

When I met her first then she was a successful teacher of Bagbazar Women's College After that she went first to Rabindra Bharati University and then settled at the Jadavpur University as an eminent Professor of Sanskrit Department of JU. In different Seminars and Workshops held in those Universities we met each other.She always welcomed me with much warm approach as like two sisters meet after a long time.

Almost at the end of her glorious life when she formed 'Convergence' as an Academic Institution she invited me there and included me in her Whatsapp group. To celebrate the Centenary Birth Celebration of Pandit Nityananda Mukhopadhyaya she published a Research Journal and invited me to give a paper there. To honour her request I gave a

paper instantly and accordingly she published that and told me to give more Research papers.

She was an erudite scholar of Modern Sanskrit Literature. She authored many books and Research papers.Her scholarly activities were not only confined to national level but her works claimed also International Recognition.

Her dream project was ‘Convergence'. I think her daughter Soumyanetra is much efficient and able like Ritadi to carry on her incomplete work. I myself promise to help her in that respect much in my humble way.

Ritadi was a great scholar of Classical Sanskrit Literature but she did not restrict her interest in a specific area of knowledge and she felt much interest in Ayurveda also. So I decided to give a Research paper on ‘Ayurveda', though I have scant knowledge on Ayurveda.

Ritadi was awarded a lot of awards in her whole life. At the fag end of her life she was selected for *Pranabananda Lecture Award* from The Asiatic Society but before receiving that award she left us all. With this, I would like to place my respect to the departed soul of acclaimed Sanskrit Scholar, Ritadi.

(Dr. Rita Bhattacharyya is a senior Researcher of the Àsiatic Society,Kolkata.Now she is engaged there as Principal Investigator of a Research Project. She taught Sanskrit in various institutes like Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park and Jadavpur University (Manuscriptology and Paleography Section of Sanskrit Department).
She has a number of published books: (both in English and Bengali) and about 70-80 published papers (both in English and Bengali) to her credit in different national & international journals.)

Āyurveda as delineated in Someśvara's *Mānasollāsa*

Dr. Rita Bhattacharyya

(Principal Investigator of a Project in The Asiatic Society)

The Cālukya monarch Someśvara III suggested tantra, mantra and kriy*ā* for the diseased persons in his encyclopaedic text *Abhilaṣitārthacintāmaṇi* ,otherwise known as *Mānasollāsa* In the same text he prescribed the alien food,drink and treatment for the ailments.It is said there:

Ārtā yatnena saṃraksyah tantra-mantra-kriyādibhiḥ /

Teṣām anveṣaṇnam kāryam pānānna- śayanasanaiḥ //[1]

The identical rendering is obtained in the *Caraka-Saṃhitā.*There it is said:

Rogam ādau parīkṣeta tato'nantaram auṣadham /

Tataḥ karma bhiṣak pascāj jñanapūrvam samācaret // [2]

Caraka advises, a physician should have an exhaustive theoretical knowledge of the nature of all diseases-their specific sources,exciting factors,preliminary indications,bodily symptoms,local pains caused by them ,possible complications and aggravations,degrees of severity,periods of duration and indications of recovery and convalescence.After examining all these essential factors the physician should apply medicine on the patient.[3]

Different types of diseases and their management practices are also discussed in *Mānasollāsa* . The diseases are------ *jvara,raktapitta,kāsa, śvāsa,yakṣma,chardi,madatyaya,arśa,sarana and grahaṇī , mūtrakṛccha, prameha,vidradhi,gulmakoṣṭha,pāṇḍu,sopha,visarpa,krṣṇaśvitra,valamaya* and *vātaśonita.*Someśvara is of the opinion that all these diseases should be treated according to the precepts of the Āyurvedaśāstra.Disease according to Ayurveda, is a condition of the

body and mind which results mainly from abnormal states of the fundamental elements(dhātus) of the human system. Restoration of normalcy depends on proper understanding of the factors leading to physical and mental growth and (or) decay.Doṣas are the causative roots of all such diseases. The intensity of aggravation of a disease depends on the extent to which the three humours are deranged. Every doṣa does not ,however, result in all its possible associated effects. In diagonising a disease the physician should study the distinctive symptoms indicating derangement of one or more humour. So Someśvara says-

jñātvā nidānam vyādhinām svarupam lakṣaṇaiḥ sphuṭam /

Deśakālānusāreṇa sātmyaprakṛtitattvataḥ //4

The heat is the essential element of the body. When it is restored in abdomen then the equilibrium retains but when the heat warms up the whole body then it becomes jvara,which is the 'monarch of all diseases' (*sarvavyādhipati)*. Following the rules of Ayurveda the author declares that properly prepared medicine destroys the defects of the abdomen.But the unprepared medicine does not do so but it acts like honey.Vāyudoṣa,bala,kala,prakṛti and kāra*ṇ*a are supposed to be the source point of all diseases. So the body should be made pure by destroying all the evils. The author further observed that the concept of three humours,i.e.,vāyu (gaseous element), pitta (fiery element) and kapha (liquid element) forms the basis of Ayurvedic medicine. So he said-

Vāta-pitta-balāsānām jñātvā lakṣaṇam utkaṭam /

Tasyopaśamanairdravyaiḥ kṛtvā peyam pradāpayet //[5]

He said that when a patient suffers from pain then it is called vāta. When he feels feverish then it happens due to excess of pitta and in case of kapha lathergy or sloth strikes the patient.[6] *Vāyu* in its five forms, has the properties of dryness,

coldness,lightness,immeasurable latent power and great speed. It maintains a desirable equilibrium among the *doṣas* (humours),*dhātus* (physiological elements) and *agni* (heat) present in the body.Pitta, in its five types, contributes to the process of agnikarma (metabolic combustion). Some of the functions of agnikarma are characterized as the separation of digested food elements as chyle,excreta, urine etc; supplying colour matter to blood; and imparting motion to body activities,vision to the eye and lustre to the skin. The principal activities of kapha or śleṣman, in its five forms are strengthening and promoting bodily endurance and contributing to proper and healthy functioning of the body.When these humours became deranged then the treatment of the patient appears difficult. Vāgbhaṭa in his medical treatise *Aṣṭāṅgahṛdaya* says that the aggravated humours are the causes of all diseases.He says-

Sarveṣām eva rogānām nidānam kupitāḥ malāḥ /[7]

To help keep the *dhātus* in balance, Ayurveda prescribes food of different rasas(tastes), thus avoiding excess or deficiency of any particular kind of substance in the body. In a balanced state they are termed as *dhātu* (that which upholds) and in an unbalanced state they are called *prakṛti-dosa* (constitutional *-dosa* or deranged humours). In appropriate proportions, these dhatus contribute to the efficiency of all sense-organs and to the strength,colour and health of the body,thus promoting the longevity of a person.

Someśvara stressed much on the nature of food for the healing purposes of the diseases. Prof. Brajendranath Seal incidentally observed that the food we eat contains five classes of organic compound. From their radicles or predominant elements, the substances are named earth compounds,water or ap compounds,*tejas* compounds,*vāyu* compounds and *ākāśa* compounds.The flesh,for example,is a tissue composed principally of the earth compounds;the fat, of the earth and ap compounds; the bones, of earth, *vāyu*

and *tejas* compounds. Different operations of the metabolic heat,perhaps different digestive fluids are also meant,are required to digest the different substances in the food.[8]

Someśvara defines the characteristics of the physician in his chapter *Vaidyakalakṣaṇa* and says that a king should appoint a Vaidya who has gathered sufficient experience in treatments of men,horses,elephants,cows and other animals.The Vaidya should have exhaustive training in the methods of eightfold treatments,which corresponds to the *Carakasaṃhitā* where Caraka explains eight causes as the sources of jvara.Caraka says,intenstanile heat is the source of all heat so the physician should have keen observation to retain this heat in proper treatment. Someśvara also gives importance to this intenstanile heat and advises that one should keep away the intenstanile heat and retain wind,heat,pitta in the proper position.He further says that the humours are balanced in normal health.When the three humours *vāyu,pitta* and *kapha* become abnormal(*prakupita*), and the various waste products of the body tend to weaken or destroy the body,they are called malas.[9]

Someśvara observes that the primary fever (*nutanajvara*) warms up body by getting the mala or excreta hindered and generates *hṛllāsa,hikkā* and *aruci*.The *Garudapurāṇa* detected all such aspects (*aruci,avipāka,tandrā, ālasya*) as the source of fever.[10] The *Agnipurāṇa* prescribes the decoction of ṣadaṅgapāṇiya (the infusion of six drugs) for healing fever.like the great Ayurvedic Physician Dhanvantari, Someśvara also defines fever as the monarch of all diseases (*rogapati*).He also gives the definition of different types of fever like *santata,satata,anyedyu,tṛtiyā* and *caturthaka* fever. Someśvara also discusses different types of diseases and the process of remedy.The diseases are śopha,raktapitta,the origin and ailments of *śvāsa* and *kāsa*.He also told that when *vāyu* with *kapha* becomes abnormal then *kāsa* appears and it touches the heart and its side.He also said that when cough becomes old the respiration trouble begins then the

karcura,root of pauskara and dried āmalaka fruit accompanied with ghee is suggested as the diet of this disease.

After that Someśvara discusses the characteristics of tuberculosis (*kṣayaroga).*When the vāta becomes abnormal and affects the joints of the body then the *kṣayaroga* manifests.In the *Garudapurāṇa kṣayaroga* is considered the monarch of all diseases.When a growth is seen in rectum then it is called piles.The ointment made out of *sṛṅgi,haritaki* and *bhallātaka* fruit is advised to be used for removing piles.[11] Apart from that the symptoms of *atisāra,grahani* and *mūtrakṛccha* are described in this text.Among those the Urinary trouble like painful discharge of urine (*mūtrakṛccha*),its different varieties and symptoms are highlighted by Someśvara .This disease is the outcome disbalance of three humours,i.e. *vāta,pitta* and *kapha*.In *mūtrakṛccha,*a disease caused by *vāta,*a pain is felt in *vasti,mehana*(urinary duct) and *vaṅkṣana.*Dhanvantari says,pain and little discharge of urine are the characteristics of such disease.Garudapurāṇa narrates this as -*vasti-vaṅkṣana-medhrashi-yuktamalpam muhurmuhuh.*[12] In mūtrakṛccha ,caused by pitta,yellow coloured urination ensues. And in *mūtrakṛccha* ,caused by kapha blood passes through urine. Likewise Someśvara also depicts-*trividham mūtrakṛccham syāt vāta-pitta-kaphodbhavam/*[13]

He also discusses about the urinary disease (*prameha*).Drinking sweet,cold,acidic,rich and slippery water excites kapha which culminates into prameha. *Mānasollāsa* prescribe the decoction of honey mixed bilva and honey mixed guduci for the diseases person.[14] In such a way Someśvara also explains the symptoms and remedial processes of different diseases like *vidradhi, gulma* and *pānduroga*. *Mānasollāsa* declares that *pānduroga* appears when the skin becomes yellow and as an effect the skin and flesh are affected accordingly.Moreover in *Mānasollāsa* we get the causes of *visarpa* and *kuṣtha.*There it is said that the unhygienic and unjustified food and drink,denegration

of ascetics and sinful act welcome *kuṣṭha śvitra* or leprosy,which is supported by Dhanvantari and *Garudapurāna.*According to them this disease is also found to make the skin discoloured when the three humours,i.e. *vāyu,pitta* and *kapha* become abnormal then only this disease appears.Cakrap*āṇ*idikṣita,in his commentary *Āyurvedadipikā* on Carakasaṃhitā,opined that the evils of both kuṣtha and visarpa are similar.But the difference between them lies in the fact that visarpa originates from the abnormality of blood compound. , The diet for *kuṣṭha* consists of decoction and juice of *rāsnā,vāsa,karañja,triphalā,kanṭakāri,paṭola nim* leaves and guduci prepared from smashed dh*ā*tri and nim leaves along with the water of dantaśatha.If the mixture would be taken fried with butter then the kuṣṭha is expected to be removed soon.The ks*ā*ra of r*ā*javṛkṣa,if applied with putikita then śvitra-kuṣṭha goes away and the skin becomes regular coloured again. The great sage Agniveśa in *Carakasa*ṃ*hitā.*,prescribes ten items for the prevention of kuṣṭha. They are ------------*khadira,abhaya*, *āmalaka,haridrā,puskara,saptaparṇa,aragvadha,karavira*. Cakrap*āṇ*idikṣita comments upon his commentary-*khadira kuṣṭhaharaṇam* (Su.a.25) *iti vacanena kuṣṭhahara bheṣajeṣu pradhānam*. But Someśvara does not mention khadira as having effect against *kuṣṭha*. *Garudapurāṇa* points out *śvitra* and *kilāsa* as different varieties of *kuṣṭha*; Vāgbhaṭa in *Aṣṭāṅgahṛdaya* also admits this.

After discussing the repellants of *kuṣṭha* Someśvara advises the varieties of diet for healing *vātavyādhi*; *vāta* disease can be removed if the patient drinks the decoction of śunth,rāsnā,citraka and *devadāru* mixed with oil.Heat,salt,acid and physical exercise are also helpful for keeping away the *vātavyādhi*. The juice,decoction paste or powder of *amṛta* also destroy the age-long chronic *vātaśoṇita* disease. Someśvara identifies the aśmari disease and finds out the root of disease.Aśmari is a kind of disease known as stone in the bladder. He prescribes surgical operation for removing this type of disease. In case of swelling surgery should be performed. Otherwise the patient can drink the

juice,prepared from the decoction of *kulattha,aśmabheda* and *gokṣura* suspended in aqueos.It gives definite relief to the patient.

In this way Someśvara gives a list of diseases and also prescribes the methods to cure them alongwith proper diet. In giving his opinion he did not mention the name of any predecessor but from the intensive study of the chapter,it becomes clear that he followed the principles of his predecessors like Caraka,Suśruta,Vāgbhaṭa,Dhanvantari and others. Many citations of *Carakasaṃhitā.*,*Garudapurāna,Agnipurāna* and *Aṣṭāṅgahṛdaya* have shown close identity with the citation made by Someśvara.

References :

1. *Mānasollāsa,1.19.138.*
2. *Carakasaṃhitā,20.24.*
3. *P.Ray/H.N.Gupta ,Carakasamhita (A Scientific synopsis),p.21.*
4. *Mānasollāsa,1.19.144.*
5. *Ibid,1.19.157.*
6. *Ibid,1.19.158,*
7. Aṣṭāṅgahṛdaya *,1.12.*

8.Brajendranath Seal,*The Positive Science of the Ancient Hindus*,p.202.

9. *Mānasollāsa*,1.19.159,

Dosatraye prakupite sannipato bhavet same /

Duscikitso bhaved rogi yatnad enam upacaret //

10. *Garudapur*rāna,151.6,

Aruciśca vipakas ca stambham ālasyam eva ca /

Hrddahas ca vipakas ca tandrā ca ālasyam eva ca //

11. *Mānasollāsa*,1.19.226-229.

12. *Garudapurāna*,262.4.

13. *Mānasollāsa*,1.19.238ab.

14. *ibid*,1.19.247-249.

15. *Carakasaṃhitā.,*5.3,commentary.

16. *Garudapurāna*,168.36; cf. *Astangahrdaya*,14.37,

Kuṣṭhaikasambhavam śvitram kilāsam dārunam ca tat /

Nirdiṣṭam aparisrāvi tridhā tu udbhavasaṃsrayam //

<u>Bibliography :</u>

Caraka*, Carakasaṃhitā*.Vol.I.Ed. Haridatta-Sastrin,Lahore:Motilal Banarasidas,1940.

Cakrapānidatta, *Āyurvedadīpikāvyākhyā* See Caraka,*Carakasaṃhitā.*

*Garudapurāna,*Ed.Pancanana Tarkaratna and Srijiva Nyayatirtha with Bengali Translation.Calcutta:Nababharat Publishers,1392B.S.(rept.)

Ray,Priyadaranjan/Gupta,Hirendranath, *Carakasamhita* (A Scientific Synopsis),New U

Roy,Mira, 'Āyurveda',In:*The Cultural Heritage of India*.Vol.VI.P.R.Ray/S.N.Sen,Calcutta (now Kolkata):The Ramakrishna Mission Institute Of Culture,1991(rept.)(1st.ed.1986).

Seal,Brajendranath, *The Positive sciences of the Ancient Hindus.*Delhi/Varanasi/Patna/Madras:MLBD,(Rept.Delhi,1985).

Someśvara, *Abhilaṣitārthacintāmani*.Ed.R,Shamasastry,Mysore: Mysore University,1926.

--------------, *Mānasollāsa* Ed., G.K,Shrigondekar, *Mānasollāsa of King Someśvara* Vols.I,II & III.Baroda (now Vadodara):Oriental Institute,Vol I,1967 rept.(1st ed. 1925),Vol.II,1939;Vol.III,1961 (GOS 28,84,138).

Vāgbhaṭa, Aṣṭāṅgahṛdaya. Ed. Yadunandadana Upadhyaya. Aṣṭāṅgahṛdayam of Vāgbhaṭa with Vidyotini Hindi Commentary of Atridevagupta.Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Sansthan,1993(11th ed.)(Kashi Sanskrit Series 150).

স্মরণে ঋতাদি

শিউলি বসু

ঋতাদিকে নিয়ে কিছু লিখতে বসে আমার ২০০৫ সালের ১২ই নভেম্বরের কথা মনে পড়ে গেল। ঐ দিন প্রথম আমি ঋতাদিকে দেখি। ঐদিনে আমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের interview হয়। উনি তখন বিভাগীয় প্রধান। এর পূর্বে ওনাকে চাক্ষুষ করার সুযোগ হয়নি। ২০০৬ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী সংস্কৃত বিভাগে যোগদান করি। তখন থেকেই ঋতাদির স্নেহ পেয়েছি। এই দীর্ঘ কয়েক বছর দেখেছি ঋতাদি মাঝে মাঝেই অসুস্থ হতেন। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা; একের পর এক গবেষণাকার্যে লিপ্ত থেকেছেন, কখনও তাতে ছেদ পড়েনি। তিনি সবসময় নতুন গবেষণার তাগিদ অনুভব করেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সেই সব গবেষণাকার্য অবশ্যই মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবেে। ঋতাদির কর্তব্যবোধও অতুলনীয়। বিভিন্ন পারিবারিক বিপর্যয়ে ঋতাদিকে পাশে পেয়েছি। আমার ছেলেকে দিদি 'কুচু' বলে ডাকতেন, Phone করলেই স্নেহমাখা কণ্ঠে জানতে চাইতেন, 'কুচু কেমন আছে রে?' ২০০৯ সালে আমি গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলাম, একটি Operation করতে হয়, আমি Nursing Home এ ভর্ত্তি হই, পরের দিন Operation, হঠাৎ দেখি Visiting Hours এ ঋতাদি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ওনার এই স্নেহ সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করেছি। তাঁর বিদ্যাবংশে আমি ছিলাম না, কিন্তু কোথাও যেন তিনি আমার শিক্ষিকা ছিলেন, অনেক কিছুই শিখেছি। দিদির বক্তব্য শুনে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি, কঠিন বিষয়কে অনেক সহজ করে বলার একটা অদ্ভুত দক্ষতা দেখেছি। বক্তব্যের মধ্যে এক অপূর্ব মাধুর্য ছিল। শ্রোতারা সহজেই তাতে আকৃষ্ট হতেন।

আজ ঋতাদি ইহলোকে নেই। দিদিকে প্রায়ই বলতে শুনেছি জীবনে একটা দাগ রেখে যেতে হবে। তিনি নিশ্চয় দাগ রেখে যেতে পেরেছেন। তাঁর গবেষণার মাধ্যমে অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে তিনি জীবিত থাকবেন। 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' এই প্রবাদ বাক্যটি ঋতাদির ক্ষেত্রে অবশ্যই সার্থক হয়ে উঠবে।

(শিউলি বসু, অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রদ্ধায় স্মরণে ঋতা দি

শ্রী দেবদাস মণ্ডল

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রথিতযশা প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. ঋতা চট্টোপাধ্যায় : ঋতা দি, বিগত ১২ ই আগস্ট, শুক্রবার, ২০২২ ইহলোকের মায়া ও তাঁর বিরাটকর্মকাণ্ডের মোহ কাটিয়ে পরলোকে গমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধপ্রণাম জানাই। ইহ জগতের যাবতীয় মান, আভিমান, ক্ষোভ, দুঃখ ত্যাগ করে তাঁর বিদেহী আত্মা আজ ব্রহ্মলোকে বিলীন হয়ে পরমানন্দে বিরাজ করুক- মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা। ঋতা দির বিভিন্ন বক্তব্যে বার বার উদ্ধৃত হয়েছে মহাভারতের প্রসিদ্ধ সেই উক্তি ‘ন মনুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।’ নজরুলের ভাষায় ‘মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।’ এই ভাবনা, আদর্শ, নীতি থেকেই মানুষটির ব্যক্তিসত্তা তথা জীবনবোধের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। ঋতা দির সারস্বত সাধনা, তাঁর যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা, মানুষ গড়ার কর্মতীর্থ- ‘কনভারজেন্স’-এর ভাবনা সবই সেই মানুষকে কেন্দ্র করেই। আজ, যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব, মানবতাবোধ ভূলুণ্ঠিত, বিবেকবোধ লুপ্ত, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী দিশেহারা, সেখানে সেইসব হতাশগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অন্ধকার থেকে আলোর দিশা দেখাতে ঋতা দির ‘কনভারজেন্স’ এর ভাবনা অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়ানুগ পদক্ষেপ। ঋতা দি ছিলেন সূক্ষ্ম-অনুভূতিপ্রবণ, নীতিনিষ্ঠ, সরল হৃদয়ের, সদাশয়যুক্ত সত্যিকারের একজন ভালো মনের মানুষ। তাইতো তাঁর চিন্তায় চেতনায়, সারস্বত সাধনায় তিনি সর্বদা ‘মানুষের জয়গান’ গেয়ে গেছেন, মানুষের মধ্যে নিহিত গুণগুলি, মানুষের ব্যক্তিসত্তা, মানুষের সুকৃতি, সুনিপুণ কর্মসমূহকে সর্বসমক্ষে সুন্দরভাবে প্রকাশের চিন্তায় তিনি আজীবন মগ্ন ছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয়- ‘আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য’ যার মাধ্যমে তিনি এযুগের সারস্বতসাধনায় কৃতকর্মা মানুষদের জীবনযাত্রা, তাঁদের গুণ, কর্ম ও সুচিন্তিত ভাবনাচিন্তাগুলি অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর পথে এনেছেন। ঋতা দির এই অকালে চলে যাওয়া, সংস্কৃত জগতে বলাযায় ‘আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য’ গবেষণায় এক অপূরণীয় ক্ষতি হল আর অঙ্কুরেই ধাক্কা খেল তাঁর ভাবনাপ্রসূত ‘কনভারজেন্স’ সংস্থার।

‘কর্তারঃ সুলভাঃ লোকে বিজ্ঞাতারস্তু দুর্লভাঃ।’ এই জগতে বিপুল কৃতকর্মা, কর্মসাধক মানুষ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁদের কর্মের বোদ্ধা বা স্বীকৃতিদানের মানুষ সত্যিই পাওয়া দুর্লভ। ঋতা দি সেই দুর্লভ মানুষদের মধ্যে ছিলেন একজন। তিনি সেইসব কবিকর্মনিপুণ মানুষদের এবং তাঁদের সৃষ্টিসমূহ বিচারের মাধ্যমে একালের কবিসাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন কিংবা তাঁদের বিদ্বত্‌সভায় পরম শ্রদ্ধার আসন পাওয়ার যোগ্য দাবি জানিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় মানুষের সাধারণগুণগুলি হয়েছে অসাধারণ। তাঁর চেতনার রঙে পান্না হয়েছে সবুজ, চুনি হয়ে উঠেছে রাঙা হয়ে।

ঋতা দি ছিলেন অত্যন্ত একজন ছাত্রদরদী, ছাত্রবৎসল শিক্ষিকা, ছাত্রান্তপ্রাণ, ছাত্রদের আবেগ, অনুভূতি বা উপলব্ধির যেকোন বিষয় তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন, খুব কৌতূহল নিয়ে পরিবারের খবরাখবর নিতেন সকলের, তিনি একাধারে ছিলেন আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক, পথনির্দেশক। শ্রেণীকক্ষে কিংবা আলোচনা সভায় তাঁর প্রাঞ্জল ভাষায়, তথ্যসমৃদ্ধ মনোজ্ঞ বক্তৃতায় ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক সকলকেই মুগ্ধ হতেন। ইউ.জি.সি. প্রদত্ত এমেরিটাস ফেলো (২০১৭-২০১৯) হিসেবে যোগদানের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের নিয়মিত পাঠদান থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন, তবে আমাদের অনুরোধে কোনপ্রকার সম্মানিক(অর্থ) না নিয়েই নির্দ্বিধায় তিনি স্নাতকোত্তরবর্ষে নবাগত ছাত্রদের জন্য প্রতিবছর ‘আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে’র ক্লাস নিতেন। ছাত্রদের পড়া বোঝা, না বোঝা মান অভিমানের জায়গা সাগ্রহে শুনতেন। বিভাগীয় ছাত্রদের, শিক্ষকদের, গবেষকদের খবরাখবর নিয়মিত নিলেও বিভাগের কারো না কারো প্রতি তার কিছু না কিছু সুপ্ত অভিমান ছিল, যা তাঁর বক্তব্য থেকেই প্রকাশ পেত। যেকোন কিছুতেই তিনি যেন অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। যেটা অনেকসময় তাঁর শরীর ও মনের ক্ষেত্রেও অতি পীড়াদায়কও হয়ে উঠেছিল মনেহয়।

আমারা যখন স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষে ২০০২, তখন ঋতা দি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাদবপুরে আসেন। কাব্য ও কাব্যতত্ত্ব ছিল তাঁর অতি প্রিয় বিষয়, বিশেষত ‘আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য’ নিয়ে গবেষণায় তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে অন্যতম পুরোধা এক ব্যক্তিত্ব, এপ্রজন্মের গবেষকদের কাছে তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক। তাঁর বিনম্র কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, কৃতজ্ঞতা, পরিমিতিবোধ, ভদ্রতা সবকিছুই ছিল

সকলের শিক্ষণীয়। তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর সৌন্দর্যের সঙ্গে জুইসই পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহার্য জিনিষপত্রেও ছিল আভিজাত্যের ছাপ। শুধু পোষাক-পরিচ্ছদেই নয়, সমস্ত কাজকর্মেও তিনি ছিলেন নিখুঁত, অত্যন্ত পরিপাটি। সাহিত্যতত্ত্বের অধ্যপিকা হওয়ায় আমারা তাঁর 'মৃচ্ছকটিক' এর নির্দিষ্ট ক্লাস ছাড়াও আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ গবেষণাপদ্ধতি, রামায়ণ, মহাভারতের উপর বহু বক্তব্য শুনেছি। তাঁর অসাধারণ বাচনভঙ্গিমায় নতুন নতুন তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্যে সকলকে মুগ্ধ করে দিতেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে ও নাট্যশাস্ত্রে, রসতত্ত্বে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না একজন অধ্যাপিকা, দেশে বিদেশে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, গবেষণাকেন্দ্রে সেমিনারে, কনফারেন্সে, আমন্ত্রিত বক্তৃতা প্রদানের জন্য ছিল তাঁর অবাধ গতায়াত। বিশেষত সমাজে অবহেলিত সম্প্রদায়ের প্রতি, নারীদের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ বরাবর-ই ছিল, তিনি আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের তাঁর স্বামী ঁসুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড থেকে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সহায়তাও করেছেন। ভারতের নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ, প্রাচীন ভারতের চিকিত্সা বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও মুসলমান সম্প্রদায় নিয়ে তিনি নানা গবেষণা করেছেন।

নিজের ছাত্রাবস্থা কিছুটা কাটিয়ে যখন আবার নিজের বিভাগে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করি, স্বভাবত-ই নিজের স্যার, ম্যাডামদের সামনে চলাফেরা, কর্তাবার্তা বলা একটু হলেও মনে সংকোচবোধ হত। মাঝে মাঝে ওঁনার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে সস্নেহে বসতে বলতেন। বসতাম। উনি নিজেই চা নিয়ে আসতেন, হয়তো চা খাবেন, তখন যেন অনুমতি নেওয়ার মত-ই বলতেন, 'একটু চা খাচ্ছি রে, তুই ও একটু খা না। আমি কেমন যেন একটু হলেও অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত ভাবে বলতাম- 'না দিদি আপনি খেয়ে নিন, আমি তো এমনি খুব একটা চা খাই না, তারপর চিনি ছাড়া একদম খেতেই পারি না। এরপর থেকে তিনি প্রায়শ-ই চিনি কিংবা সুগার ফ্রি বড়ি ৪-৫টি দিয়ে দিতেন, চা খেতে খেতে নানা খবরাখবর নিতেন ইত্যাদি...। এভাবে মাঝে মধ্যে তাঁর কাছে যাতাযাত করতে করতে কবে যে তাঁর অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলাম কে জানে! পরম বিশ্বস্তভেবে তিনি যেকোন কাজে যেন আমার একটা ভালো-মন্দ মতামত জানতে চাইতেন। আর আমিও নির্বোধের মত একেবারে যেন দায়িত্ব নিয়ে ওঁনাকে ভালো-মন্দ মতামত জানাতাম।

সেবার ঋতা দির সঙ্গে 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' নিয়ে রিফ্রেসার কোর্সের কোওয়ার্ডিনেটর হওয়ার সুবাদে ওঁনার কর্মনৈপুণ্যতা উপলব্ধি করতে পারি। কর্মোৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য ওঁনার অনলস প্রচেষ্টা সত্যি মনে রাখার মত, যে-কোন অনুষ্ঠানকে কিভাবে উৎকর্ষমণ্ডিত করা যায় তাঁর সান্নিধ্যে না থাকলে বুঝতে পারতাম না। ওঁনার পরিচিতির জগৎ ছিল বিরাট বড়, বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের নিয়ে এসে যেকোন অনুষ্ঠান, যেকোন সেমিনারকেও তিনি একটি অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারতেন। আতিথেয়তার দিক থেকে বিচার করলে ঋতা দির জুড়ি মেলা ভার। সেবার ঐ রিফ্রেসার কোর্সের অতিথিসেবায় কোন কার্পণ্য না করায় রিফ্রেসমেন্ট বাবদ বরাদ্ধ অর্থের বাইরে খরচ করে ফেলায় অতিরিক্ত ব্যয়কৃত অর্থ শেষপর্যন্ত তিনি নিজের একাউন্ট থেকেই পরিশোধ করেছিলেন। বিভাগে তাঁর ঘরে গেলে কিংবা বাড়িতে উত্তম আহার না করিয়ে তিনি কাউকেই ছাড়তেন না।

জনপ্রিয় অধ্যাপিকা হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী মহলে ঋতা দির ভীষণ সুখ্যাতি ছিল। পড়াশুনার বাইরে অনেকসময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব কাজ-কর্ম, সুবিধ-অসুবিধার কথা শুনতেন, অতি আপন জনের মতন করে খবরাখবর নিতেন। ব্যক্তিসত্তা, সারস্বত সাধনা, সততা, কোমলতা ও কাঠিন্যের মিশেলে ঋতা দি এক অনন্যসুন্দর মানবিকতার প্রতিমূর্তি হওয়ায় তিনি সকলের কাছে পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। হ্যাঁ, ঋতা দির আত্মাভিমান, সত্যিই বোধহয় আর পাঁচ জনের থেকে একটু বেশিই ছিল। থাকাটাই স্বাভাবিক, তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, আন্তরিক, সরল ও উদার মনের মানুষ। তিনি যেহেতু সরলমনে কাউকে বিশ্বাস করতেন তেমনি একবার বিশ্বাসের পাত্র হয়েগেলে খুব আন্তরিকভাবেই তাঁকে সাহায্য করতেন, সহানুভূতি দেখাতেন, তিনিও চাইতেন তাঁর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিটি একান্ত আপন করে তাঁর সেই ভালোবাসা বা বিশ্বাসের মর্যাদা দিক কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মে যেন ঘটত তার বিপত্তি(বিশেষত তাঁর অধীনস্থ গবেষক/গবেষিকাদের ক্ষেত্রে), তাই কেউ যদি তাঁর সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করতেন বা তাঁর ভালোবাসার গুরুত্ব না দিতেন, কিংবা উপকারকে অস্বীকার করতেন বা স্নেহের আবর্তকে লঙ্ঘন করতেন তখনই তাঁর মান-অভিমানের পাল্লাটা স্বাভাবিকভাবেই যেন ভারি হয়ে যেত।

কনর্ভারজেন্স তৈরি হওয়ার সূত্র থেকে ঋতা দির সঙ্গে সম্পর্ক ও আলাপচারিতা আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়। যেকোন বিষয়ে তিনি পরামর্শ করতেন, এমন কী রাত তিন-চার-টার সময়ও ওঁনার কনভারজেন্স নিয়ে

ভাবনাচিন্তা বা কারো কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত পাওয়ার কারণে তাঁর মনখারাপ বা মানসিক অস্থিরতার কথা ইত্যাদি তিনি ভয়েস ম্যাসেজে পাঠাতেন। অবাক হয়েছি, আশ্চর্য হয়েছি, কারণ- প্রথমত, এই বয়সে এতরাত জেগে উনি এই সব ভাবছেন এবং এই রাত্রিতেও তিনি সেগুলো আমার সঙ্গে শেয়ার করছেন। কতটা বিশ্বস্ত হলেই এটা সম্ভব! আমি চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব সেই বিশ্বাসের মূল্য দিতে। দ্বিতীয়ত, ওঁনার অন্যের প্রতি ক্ষোভ-অভিমান ওঁনাকে কতটা পীড়া দিত, যেটা তিনি এত রাত্রেও সেটা নিয়ে ভেবে নানা ভালোমন্দের অনুভূতি তিনি প্রকাশ করছেন, যেটা তাঁর শরীরের পক্ষে ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছিত। হ্যাঁ, তাঁর সুগার বা অন্যান্য কিছু রোগের যান্ত্রিক চিকিৎসা হয়তো অনেক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর এই সব রোগের মূল যে মানসিক দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ- তার চিকিৎসা কতটা হয়েছে ভগবান জানেন!

যেখানে থাকুন ঋতা দি, নিশ্চিন্তে থাকুন। এই পৃথিবীর রঙ্গশালার যত মান অভিমান, যতসব হিংসাদ্বেষ, সমস্ত শোক, গ্লানি, পরিতাপ ভুলে আপনি আনন্দলোকে পরম শান্তিতে বিরাজ করুন। জ্ঞানী-গুণী ও গুরুজনদের প্রতি আপনার অকৃপণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, আপনার কর্মপথ, আপনার নিরলস পরিশ্রম, কর্মোদ্যম, আপনার সাধনা আমাদের কাছে পরম অনুপ্রেরণা। আপনার সারস্বত গ্রন্থরাজি আমাদের দিকদর্শন, আপনার মনুষ্যত্ববোধ, পরোপকারী মনোভাব, আপনার দানশীলতা, ঔদার্য যতদিন যাবে এসবকিছুর নিশ্চিত মূল্যায়ন হবে, অকালে আপনি হারিয়ে গেলেও আপনার বিপুল কর্মের মধ্যেই আমরা আপনাকে ঠিক খুঁজে পাবোই। প্রতিবছর আপনার একের পর এক সৃষ্টি এক এক জন মানুষের সাহিত্যসাধনা নিয়ে বা নতুন আঙ্গিকে নতুন নতুন গ্রন্থপ্রকাশের মাধ্যমে জানা অজানার বহু খবর আপনি রানারের মতো-ই সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, কিন্তু আপনার জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম, কত নির্জন বিনিদ্ররাতজাগা, কতসুখ, কত শোক, কত রোগ, কত যাতনার স্মৃতি, বেদনায়, অভিমানে কিংবা অনুরাগে কিভাবে যে কেটেছে তার খবর কে বা জানে? আপনাকে নিয়ে, আপনার জীবনসাধনা নিয়ে সত্যিকারের কোন নতুন খবর পাবো— এই অপেক্ষায় রইলাম।

(শ্রী দেবদাস মণ্ডল,সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

Rita Chattopadhyay: an extraordinary scholar and organizer

Pradeep Parrack

I got acquainted with Rita Chattopadhyay (whom I used to call 'Ritadi') through my wife Swati who had been her student for many years. A very dignified lady who was full of beauty and grace, Ritadi was a great speaker whom it was pure pleasure to listen to. I have had this fortune only a handful of times, but do remember how she kept her audience enthralled.

My first memories, however, are connected more with Ritadi's husband Sudipto Chattopadhyay and his father Sunil Chattopadhyay. Soon after I got married to Swati in 1986, she took me to meet Sunil Chattopadhyay who used to live near her house and was a friend of her uncle Binoy Bhattacharjee. He presented me with a book, Spartacus, that he had translated into Bengali. In addition, he also lent me the original English book by Howard Fast, so that I may appreciate how well the translation had been done. It is rather unfortunate that I did not have the chance to meet him again, since I had been staying away from Kolkata for several years at that time. Much later, I accompanied Swati to see an ailing Sudiptoda at his quarter in Alipur. That was the first time I met Ritadi, although I don't remember much from that meeting. Nevertheless, I used to hear about her from Swati, about how she had been helping and encouraging Swati throughout the years, and always trying to keep her connected with various academic activities, seminars and lectures.

My first meaningful encounter with Ritadi was in 2011 when I was looking for Bengali articles for my monthly magazine 'Maskabari' that I had started about six months ago. Through Swati I came across an interesting article by Ritadi, on Siddheshwar Chattopadhyay ('Buroda', 1918-1993), apparently an important name in modern Sanskrit

Drama, but about whom very few knew at that time. Ritadi had delivered a speech covering the main contributions of Buroda in September 2001. I printed this speech as an article in the sixth issue of my magazine, published in February 2011, after having taken her permission. This article contained an extensive discussion on 'Dharitri Pati Nirbachanam', a modern satire written in Sanskrit as a drama by Buroda. While undertaking the copy editing for the article, I realised the depth of Ritadi's scholarship and became aware of her great efforts at transforming an apparently difficult topic so interesting and readable even by those outside the realm of Sanskrit.

Later I happened to meet Ritadi a number of times and watched with great amazement at her abilities to organise various seminars and assemble a galaxy of learned people. It appeared that all this came to her quite naturally.

I must mention that I had published one more piece by Ritadi in my magazine 'Maskabari' in 2017. It was a drama, 'Chipitok Charbanam' by Srijib Nyaytirtha, which Ritadi had translated into Bengali. It was through her that I got to know her elder brother Rupak Biswas, an excellent author who became a regular contributor to my magazine. He is quite popular with my readers, and has published 15 stories and articles in Maskabari so far, since 2013.

More recently, I got to know Ritadi a bit more intimately when she started 'Convergence', a rather ambitious project encompassing educational and other courses, popular lectures, medical aid for the needy etc. I agreed to be a part of this endeavour mainly for two reasons. Firstly, it was exciting to be a part of such a great enterprise and to be able to work alongside her as a team member; but more importantly because when Ritadi requests you to do something, you simply cannot say 'no'. Unfortunately, what I was supposed to do did not materialize, but in the course of planning it I had the occasion to

interact with Ritadi. I could immediately feel the bubbling enthusiasm on her part. At the same time, I felt that it is not going to be easy to keep up with her pace of working.

Looking back, I feel that it was Ritadi's style and pace of work that perhaps took a toll upon her health, and ultimately, took her away forever. She was a perfectionist and expected everyone working with her to be so. Others struggled to keep pace with her speed, meticulousness and enthusiasm. As a result, she would have become frustrated at not being able to achieve what she had planned. Whatever the reason be, we have lost her in person and will keep missing her as we carry on working with 'Convergence'. At the same time, she will continue to be ever present, her absence inspiring us even more to work sincerely and with full application. In a way, 'Convergence' was her second existence. It is upon us to keep it running, so that our beloved Ritadi can keep living with the respect and honour she deserves.

Pradeep Parrack (pradipparrack@gmail.com) did his MSc in Physics from Calcutta University and PhD in Biophysics from Indian Institute of Science, Bengaluru. He served the department of Biochemistry, Bose Institute, working in the area of gene regulation in prokaryotes, and retired as a professor in 2017. Thereafter he worked with the Publication Unit of Bose Institute till September 2018. Since 2010, he has been editing and publishing a limited-edition monthly magazine 'Maskabari', which is still running. He has also authored a book of poems in Bengali 'Kono Obhijog Nei' in 2001. He loves to write articles in Bengali on various topics related to science, and enjoys translating from English to Bengali. He has published several scientific papers during his academic career, has edited books and journals, and has supervised 14 PhD students.

ম্যাম্ ও কনভারজেন্স

সুজিত মাইতি

অধ্যাপিকা **ঋতা চট্টোপাধ্যায়**, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা, গ্রিফিথ্ পুরস্কার প্রাপ্ত, ইউজিসি এমিরিটাস্ ফেলো (২০১৭-১৯) এই রকম অনেক শিক্ষাজগতের অলঙ্কারেই তিনি ভূষিত ছিলেন। ম্যামের সাথে আমার খুব কমদিনের পরিচয় থাকলেও সেটি ছিল খুব নিবিড়। আমি ২০২১ এ সেপ্টেম্বর মাস থেকে ম্যামের অ্যাকাডেমিক অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে ম্যামের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছি। সেই সুযোগ পাওয়ার ঘটনাটি এখনও স্মৃতির মণিকোটায় জ্বলজ্বল করছে। ২০২১ সাল আগস্টমাস, আমাদের গ্রামের বাড়ির ওখানে তখন দামোদর নদের জল বাড়ার কারণে বন্যা হয়েছে, বন্যায় ছাদে বসে ফেসবুকে একটা পোস্ট প্রচুর শেয়ার হতে দেখলাম। কোন এক নামী পত্রিকার এক টুকরো অংশ, যেটি কর্মখালির অংশ ছিল। সেখানে লেখা ছিল নিউটাউনের বাড়িতে সাপ্তাহিক একদিন করে সংস্কৃত জানা ইংরাজি ও বাংলা টাইপ প্রভৃতি কর্মে দক্ষ অ্যাকাডেমিক অ্যাসিস্টেন্ট লাগবে। আমার সেই সময় ফেলোশিপও বন্ধ, তাই মুহূর্ত বিলম্ব না করে নিচের দেওয়া নাম্বারে ফোন করি। অনেকেই ফোন করার কারণে কিছুটা পর রিং হয় তারপর ফোনের ওপারে একটা স্নেহময় কণ্ঠ, তখনও পর্যন্ত অজানা অপরিচিত এক মহিলা কণ্ঠ আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলো ও পারিবারিক পরিস্থিতিরও খবর নিল। তখনও জানতাম না উনিই সেই আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে দিগ্বিজয়ী বিদুষী অধ্যাপিকা ঋতা চট্টোপাধ্যায়। তারপর টাইপিং পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রায় ৩০ জনের মধ্যে থেকে আমিই ম্যামের সান্নিধ্যে থেকে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। এর জন্য দুজনকে ধন্যবাদ না দিলে হয়তো অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেব। সেই দুই জন হল সৌম্যজিৎ দা (অধ্যাপক, কোচবিহার পঞ্চাননবর্মা বিশ্ববিদ্যালয়) ও বিবেক দা (অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ)। যদিও আগে থেকে ম্যামের পাণ্ডিত্যের কথা কখনও আমার অধ্যাপকদের থেকে কখনও বা দাদা-দিদিদের মুখ থেকে কখনও বা অল্পসময়ের জন্য ম্যামের বক্তৃতা

থেকে বা ম্যামের বই পড়ে জানতে পারলেও সেটি ভালো ভাবে অনুভব করতে পারি যখন ম্যামের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। উনি হসপিটালে ভর্ত্তি হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত সারস্বত সমাজের সেবায় নিরন্তর যুক্ত ছিলেন। সারস্বত সমাজের প্রতি গভীর ভালোবাসাই ছিল এই কর্মোদ্যোগের মূলমন্ত্র। তাঁর মাতৃতুল্য স্নেহ থেকে অন্যদের মতো আমিও বঞ্চিত হইনি। আমি কি খেয়ে এসেছি, কিছু খাবার এনেছি নাকি প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিদিনই প্রথমেই খোঁজ নিতেন। যেদিন খাবার নিয়ে যেতে পারতাম না সেই দিন ম্যাম্ কখনও ওর্ডার দিয়ে বা কখনও দেবুদাকে দিয়ে আমার টিফিনের ব্যবস্থা করতেন। এটাই মহৎমানুষের পরিচয়। আমাদের খাওয়াতে পারলে ম্যাম্ নিজে খুব খুশী হতেন। আর সব থেকে অবাক হতাম খাবার আনলে সেটা দিদি নিজে প্লেটে করে আমাদেরকে পরিবেশন করতেন। দিদি নিজে এতও বড় প্রতিষ্ঠানের (ISI) অধ্যাপিকা তারপরও বাড়ির সবকিছু সামলে এগুলোও করছেন- এটা ভেবে প্রথম প্রথম অবাক হলেও পরে অনুভব করি উনি তো ম্যামেরই মেয়ে, তাই এটাও স্বাভাবিক।

সারস্বত সমাজে ম্যামের অবদান নিয়ে বলার দুঃসাহস আমার নেই। তাঁর তত্ত্বাবধানে হওয়া গবেষণাগুলি আধুনিক সাহিত্যকে নতুন দিক্ দেখিয়েছে এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। ম্যামের লেখা বইগুলি ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপকদের কাছে সর্বদাই অনুসন্ধিৎসার একটা বড় ক্ষেত্র হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমেই সারস্বত সমাজে অমর হয়ে থাকবেন। শারীরিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সর্বদা সারস্বত সমাজের কর্মে নিয়োজিত থেকেই নিজেকে আনন্দিত রাখতেন। ‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন’ এই গীতার অমৃত বচনকে ম্যামের জীবন প্রতিফলিত হতে দেখেছি। কখনও ম্যামের কাছ থেকে একটু বকা খেলেও সেই বকাতেও ছিল মাতৃসুলভ স্নেহ। আমাকে এক অধ্যাপক বলেছিলেন যে- ‘অধ্যাপিকা ঋতা চট্টোপাধ্যায় হল জ্যান্ত সরস্বতী। ওনার কাছে কাজ করছো দেখবে সেটার অনুভব হবে’। সত্যিই সেই অনুভব আমার হয়েছিল যেদিন (৩০শে জুন) আমি অ্যাপেলোতে ম্যামকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেই দিনটি আমার জীবনের স্মরণীয় দিন হিসাবে থাকবে।

কনভারজেন্স ছিল ম্যামের স্বপ্ন। ম্যাম্ তাঁর সবকিছু দিয়ে সারস্বত সাধনার চর্চাক্ষেত্ররূপে কনভারজেন্স-কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কনভারজেন্স তাঁর যাত্রাপথ শুরু করে পাঁচটি নবীন ভাবনা নিয়ে। সেগুলি হল- Publication, Library, Philanthropy, Research ও Cultural activities।

কনভারজেন্সের প্রথম পাবলিকেশন্ হল ম্যামের লেখা বিদুষী বঙ্গনারী রমা চৌধুরী বইটি। তাঁরপর ম্যাম্ পণ্ডিতমশাই নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের শতবর্ষ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত করেন। যেখানে আছে বিশিষ্ট অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও গবেষকদের রিসার্চ আর্টিকেল।

ম্যামের নিজস্ব সংগ্রহে থাকা প্রায় ৬০০০ বই নিয়ে তৈরী হয় কনভারজেন্স লাইব্রেরী। যেখানে আছে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক অমূল্য বই। যেগুলি গবেষকদের ও ছাত্রদের বিভিন্নভাবে উপকৃত করবে। নভেম্বর মাস থেকেই এই লাইব্রীরটি গবেষক ও ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত হবে। যেখানে সপ্তাহের কিছু নির্দিষ্ট দিনে বসে পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকবে।

কনভারজেন্সের দ্বারা কিছু লোকহিতকর কর্ম (Philanthropy) করার চিন্তা ভাবনাও ম্যাম্ করেছিলেন। যেটি বিভিন্ন সময়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কখনও বসে আঁকা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কখনও বা বিনামূল্যে দুঃস্থদের সেবার জন্য বিশিষ্ট ডক্টরদের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়েছেন। কখনও বা সারস্বত সেবায় যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অথবা সমাজের বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত বিশেষ করে মহিলাদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেছেন।

কনভারজেন্সের রিসার্চ উইং-এ নিয়মিত মাসিক শিক্ষামূলক বক্তৃতা নির্দিষ্ট করা হত। যেমন- হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মেমরিয়াল বক্তৃতা, গঙ্গাধর কবিরাজ মেমরিয়াল বক্তৃতা, রমা চৌধুরী মেমরিয়াল বক্তৃতা ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু ভাষা শিক্ষার সার্টিফিকেট্ কোর্সেরও আয়োজন ছিল। যেমন- জার্মান ভাষা শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, ওড়িয়া ভাষা শিক্ষা প্রভৃতি।

কনভারজেন্সের কালচারাল্ অ্যাক্টিভেটিশ-এর মধ্যে ছিল কিছু শিক্ষনীয় কোর্স। যেগুলি তিনি প্রাথমিকভাবে বিনামূল্যে সবার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। কোর্সগুলির শিক্ষকহিসাবে নিযুক্ত ছিলেন সেই সেই ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সেই কোর্সগুলি হল- যোগ অভ্যাস, সঙ্গীত শিক্ষা, বাংলা কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি।

কনভারজেন্সের এই মহাযজ্ঞ পরিচালনার সমস্ত ব্যয়ই ম্যাম্ তাঁর নিজের পেনশান্ থেকে নতুবা তাঁর প্রয়াত স্বামী সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় স্যারের সঞ্চিত অর্থ থেকে করতেন। এবং এই কনভারজেন্স যাতে কিছু দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাময়িক কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারে সেদিকেও সদা সচেষ্ট ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ আমিই কর্মসূত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এছাড়া আরও অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের সাথে কখনও নিয়মিতভাবে কখনও বা সাময়িকভাবে যুক্ত ছিলেন বা রয়েছেন। ম্যামের এই অকাল প্রয়াণে কনভারজেন্স খুব কম দিনের মধ্যেই মাতৃহারা হলেও গুড়িয়া দিদি অর্থাৎ সৌম্যনেত্রাদি দায়িত্ব তুলে নিয়ে কনভারজেন্সের গতিকে সচল রেখেছেন। সকল গুণীজনদের শুভেচ্ছাকে পাথেয় করে কনভারজেন্স-এর নিঃস্বার্থ কর্মোদ্যোগ আগামীদিনের সমাজকে নতুন দিগন্ত দেখাবে এই আশা রাখি। ম্যামের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। এবং কনভারজেন্সের সদা সাফল্য প্রার্থনা করি।

(ড. সুজিত মাইতি, অ্যাকাডেমিক্ অ্যাসিস্টেন্ট, কনভারজেন্স,
অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, লালবাবা কলেজ, বেলুড় মঠ, হাওড়া।)

Ma: Here and Now

Soumyanetra

“Mother died today. Or, maybe, yesterday; I don’t know. I had a telegram from the home: ‘Mother passed away. Funeral tomorrow. Yours sincerely.’ That doesn’t mean anything. It may have been yesterday.” (Albert Camus, translated from French by Joseph Laredo)

These were the opening lines of one of the most influential novels ever written - The Outsider by Albert Camus. When I first read these lines, I was inclined to interpret them in the usual prevalent sense - that they are used to acquaint the readers with the nature of the protagonist Meursault who is unapologetically truthful - to the extent that he doesn’t seem to know when his mother passes away and doesn’t pretend grief and hence ends up not crying at his mother’s funeral. So basically he’s an outsider in society, he doesn’t fit in in the usual sense, he’s a reject, he doesn’t exactly behave like the others who more often than not overreact to events and circumstances, and often say much more than is actually true. Camus himself writes “A long time ago, I summed up The Outsider in a sentence which I realize is extremely paradoxical: ‘In our society any man who doesn’t cry at his mother’s funeral is liable to be condemned to death’.”

I, in a way, seem to be acting in the same way that Meursault did, albeit for entirely different reasons. Our final expressions may have been same but the reasons for them to happen are actually as distant as they can be. And that this can be true seemed to have escaped the general analysis of the novel. That is, even if one cares a whole lot about

one's mother, one could still lose track of when exactly she passes away, and not openly grieve, as I am going to express in this note.

Just because the loss of ma seems to be so timeless, so eternal, so all-pervading, it is indeed hard to keep track of time. When she was at home staying with me, it was usual for me to draw the curtains every morning, serve her Horlicks, give her medicines, make her চিঁড়ে দই, give her glasses, magnifying glass, switch on her mobile, and all the while chat about everything, from office colleagues to daughter's school, to lunch menu, to the chauffeur that was late, the flowers that has bloomed, the upcoming programs for Puja, and the shampoo that was exhausted. She too would equally participate about everything - ranging from the book project she was currently engaged in, the publisher whom she had to call, the student who was supposed to call, the hardship of the distant acquaintance, and that the maid should use less oil in her cooking.

Thereafter she often used to sit in the balcony in the sun, especially in winter and towards early morning when it wouldn't be too hot, often would talk to the two children who stayed across the street (children of construction workers, in under-construction houses on the street) and would give them chocolates and biscuits, even though it was difficult for ma to walk all the way to the dining area, get the cookie jars, take the cookies, and also the chocolates from the refrigerator, and walk back again the the balcony to lower the goodies in a pre-tied bag. Her eyesight recently had deteriorated quite a bit and she couldn't read the newspaper anymore, nevertheless she would keep the newspaper, her glasses and her mobile on a chair, beside hers.

I would usually help her move around as long as I was there before leaving for office, and while working in the kitchen when I'd turn to see her through the big glass window, I would

see her sitting with her back turned towards me. Sometimes she would doze off and her head would bend down over her chest and I would then give her a neck support pillow. Often she would share and ask me to see nice WhatsApp messages or videos or play nice songs that someone may have sent her.

In the evenings, she had a favourite spot on our L-shaped sofa and she loved sitting there tickling the toes of my daughter while I got busy making tea, serving snacks etc. At night when everyone retired for bed, I would sit with ma on her bed and often talk of the day's happenings at length, that would often wander off to distant past about times with baba and when I was a child. In short, there was no end to sharing and talking to ma - our conversation never seem to end "তোর সঙ্গে কথার কোনো শেষ নেই", she would say.

Recently it had become routine to see ma lying in bed number 295 and waiting eagerly for me whenever she was conscious. I had kept the cream and the lotion she usually put in the hospital, and mostly would apply them when I went. She would turn her face as much as she could to help me apply the cream easily. Would purse her lips as I applied the lip balm. Couldn't apply properly around the nose with the Ryle's tube coming out. I would also apply lotion in her exposed hands and feet if I could, since most of the times they are covered in channels etc.

In a way, everything was timeless. The days God had given us to be together at home seemed to be timeless - it might have been a year, maybe six months, maybe even lesser, maybe much more, the mind doesn't want to keep a track. The soul just wants to preserve the memory like a bright sun that will never die out. Even the days in the hospital seem timeless - who knows how long ma had been there. Time after all is a superficial construct of the human mind to keep track of rising and setting suns. It stops whenever the mind doesn't want to keep track.

Ma will keep on moving backwards in the superficial construct of time, measured with watches and dates and calendar. The calendar page has already turned from August and if you go by it, it seems ma is somewhere on the page and she's becoming more and more remote. But in my mind every morning, she's sitting in the balcony with her back turned towards me, and every time I leave for office, she eagerly asks me "কখন ফিরবি?", and every time I return from office, she looks at me with the most loving smile anyone has ever smiled to see me. As Richard Bach says in Jonathan Livingston Seagull, "overcome space, and all we have left is Here. Overcome time, and all we have left is Now." And between Here and Now, ma has never left me.

The only person I've ever cried in front of was ma. Especially these last few months, I cried, mostly at ma's bedside. I cried because it hurt when I could not answer her truthfully when she asked what the doctor said. I cried because the wall between us that was slowly getting built with lies and false hopes that I would try to say, was getting higher and higher and I was helpless doing anything about it. I also cried alone at night dreading what was coming - my pillow is the only witness. And I cried when, instead of cream, I was applying *ghee* on her forehead and face legs and even lips on 12th August. But I seldom cried on her funeral with many guests - that is not when it hurt the most. So not crying outwardly does not necessarily mean not grieving inside while the opposite is also true, crying outwardly does not necessarily mean grieving inside.

So in a way, I have been acting a bit like an 'outsider' of society, not exactly keeping track of when ma ceased to be with me and expressing grief publicly by crying - but that's because ma actually has never ceased to be within me - she is timelessly and lovingly enshrined in me forever.

Convergence

Swati Parrack

আজকে (26th December,2021)একটি অসামান্য কর্মোদ্যোগের কথা বলব। ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা, এমিরেটাস অধ্যাপিকাও (2017-2019) ছিলেন। আজ তিনি একটি বৃহৎ কর্মকান্ডের সূচনা করতে চলেছেন, মানুষ গড়ার কর্ম। অবসর গ্রহণের পর তাঁর এবং তাঁর প্রয়াত স্বামীর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে 'কনভারজেন্স' নামে একটি মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়তে চলেছেন তিনি। স্বামী সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ। তিনি ছিলেন BSNL-এর Chief General Manager. তিনি তাঁর সততা, কর্মদক্ষতা এবং সুন্দর ব্যবহারের জন্য তাঁর কর্ম প্রতিষ্ঠানে একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় আধিকারিক ছিলেন। এই দম্পতির জীবনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের জন্য কিছু করা। আজ এই বড় ধরনের কর্মে উদ্যোগ নিয়েছেন একাই নিজেদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে। অবশ্য সঙ্গে আছেন কন্যা ISI-এর অধ্যাপিকা সৌম্যনেত্রা এবং কিছু শুভানুধ্যায়ী। কন্যার দেওয়া নামই গ্রহণ করা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের।

Convergence কথাটি এসেছে converge এই ক্রিয়াপদ থেকে, যার অর্থ হল: একই বিন্দু বা কেন্দ্রে আসা। তাই বিভিন্ন ভাবনার মিলনকেন্দ্র হল 'convergence'.

মূলত শিক্ষাদান, সমাজকল্যাণ এবং সংস্কৃতি চর্চা হল কনভারজেন্স প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের অঙ্গ। শিক্ষার অঙ্গনে থাকছে ভারততত্ত্বের চর্চা, নানান বিষয়ের আলোচনা, বক্তৃতা, বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাদান ইত্যাদি। নানা ধরনের শিক্ষার আদান - প্রদানের এক মুক্ত মঞ্চ গড়ে উঠতে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। এখানে থাকবে না কোন রকম বিভেদ। সব ধরনের মানুষের বিভিন্ন ভাবনা মিলবে এই অভিনব প্রতিষ্ঠানে। ছাত্র শিক্ষক সকলেই একটা বৃহৎ পরিবারের সদস্য হয়ে

আনন্দের সঙ্গে কাজ করবে। যিনি শিখবেন তিনি শেখার আনন্দে শিখবেন, যিনি শেখাবেন তিনিও যেন ভালবেসে আনন্দ সহকারে শেখাবেন।

সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সঙ্গীত চর্চা, আবৃত্তি চর্চা থাকবে, থাকবে যোগ ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ।

"কনভারজেন্সে"র সমাজসেবামূলক কাজের সূচনা হয়ে গেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চাঁড়ালখালি গ্রামের বয়স্ক শিক্ষকদের ও বয়স্কা মহিলাদের সম্মাননা জানানোর আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিশিষ্ট চিকিৎসকের সাহায্যে বিনা খরচে চিকিৎসা পরিষেবা দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অনেক গুণী, জ্ঞানী ও সংস্কারমুক্ত মানুষদের নিয়ে কনভারজেন্স-এর পথ চলা শুরু হচ্ছে আজ অর্থাৎ 26th December 2021। তার সাফল্য কামনা করি। নবজাতক শিশুটির দীর্ঘায়ু ও সর্বাঙ্গীন সুস্বাস্থ্য কামনা করি। ঋতা চট্টোপাধ্যায়ের সৎ ও সাহসী কর্মোদ্যমে তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবের পথে অগ্রসর হয়ে বহু মানুষকে এক নতুন ও সুন্দর পরিবেশের দিগদর্শন করাক।

“ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে”

Soumyanetra

I was probably in class 7 or so, would be around 14 years of age, when ma was supposed to attend a conference in Malaysia. The year would be around 1994. Attending conferences abroad in those days, about three decades back was a big deal. We had a travel agent who had arranged for the foreign currency, tickets, visa etc. Psychologically, any family member traveling abroad, especially the woman of the house, meant a sort of emotional preparation for the entire family and all of us were going through that. Since we didn’t have mobile phones at that time, communication used to be quite difficult and definitely not as frequent as nowadays.

Ma had attended conferences abroad before and I knew that personally I felt, well in short, miserable. Though I wasn’t that young, I was probably way more immature for my age, and I remember I used to miss her sorely and it was unbearable to think of staying without her even for a day, leave alone for days together when she’d be in some foreign land without communication. I remember I was trying to be brave as the day approached, but on the morning when she was supposed to leave, I absolutely couldn’t control myself and broke down uncontrollably. Ma too was crying because she was much more soft-hearted and kind than I was possibly, but what she did next was totally unexpected. She actually called up our travel agent and asked him to cancel her trip (refund her tickets, though that would entail quite a bit of monetary loss, cancel her hotel booking, inform the embassy etc., she herself must have informed the conference organisers thereafter).

Cancelling a trip abroad, that needed elaborate and lengthy planning for days together, requires an unimaginable amount of mental strength even nowadays, when logistics are far more streamlined than before, and certainly in those days. And for what - because I was very sad and she couldn't bear to see me so. That was ma. To give so much importance to, what probably were whims and emotions of a child, speaks so much about her soft-hearted love and kindness. And it was not just me who was fortunate enough to have been showered with it forever - she touched everyone around her with her unhindered love and kindness.

However, I must admit, that I surely did not understand or appreciate the magnitude of her sacrifice then, the way I do now. Now, many years later, being a mother and an academic myself, and constantly struggling to balance work and family, I can understand how tough things must have been for ma. As it is, being a working woman must have been much more harder then, than it is now for me, though I must acknowledge that my father was very supportive of her endeavours and accomplishments. Additionally, financial resources were much more limited, and a lot of arrangements had to be made especially for foreign travels that were hugely expensive. So basically, even making a decision of traveling abroad for a conference itself was a very difficult one, not to mention the painstaking amount of planning that went into implementing it. And then to cancel it.

Nowadays, when I look at conference calls from abroad, obviously it takes a good deal of weighing pros and cons before deciding whether or not to attend it. Only when things seem feasible, do I venture to say 'yes' and go ahead into planning and arranging things. Once even I have had to cancel a trip within India. I guess being a mother naturally calls for such sacrifices and women get used to it without expecting or hoping for any appreciation or favour in return. But at the end of it all, cancelling a planned trip abroad on

the day of travel, requires a kind of mental stamina and love, that seems totally unparalleled and exemplary.

Not only did she display unwavering psychological strength and exceptional emotional attachment, what is even more awe-inspiring to me as a daughter, and should be to all women and men having to make such sacrifices for near ones, is that she was so wholly nonchalant about it. She actually did it so much from within that she hardly thought she had made any sacrifice at all. “Ma, may I be a mother like you”.

As I grew up she had become my greatest friend, and I, hers. And it had all started very early. I remember when I was around 8/9 years studying in class 3, I was invited for some event at a neighbour’s place. I had gone there alone and in the afternoon they had played the newly released movie Qayamat Se Qayamat Tak on their newly acquired video player. In those days TV itself was a recent addition to the drawing room, and my viewing it was mainly restricted to Mahabharata on Sunday mornings and a couple of serials scattered during the week. Going to cinema halls for watching any movie was extremely rare, and on those rare occasions it used to be very famous English movies like My Fair Lady, Guns of Navarone etc. of which we understood very little. Even rarer were Bengali movies and I don’t recall seeing any Hindi movie in the movie theatre at all.

As it is, the audio-visual impact from watching something on a large screen from close quarters is huge. On top of that it was a movie (for those of you who have seen it) containing few very intimate scenes between the hero and the heroine. And I was very sensitive in general and nearing puberty at that time. In short, the overall impact that the movie had on me was, well, overpowering. I remember I had a hard time concentrating on studies and somehow those intimate scenes from the movie just wouldn’t leave me alone.

I somehow realised I needed help and who else to turn to but ma. I knew it was hard for me to face her and talk to her so I actually wrote a letter to her - my first ever letter - which I kept in the broken hull of our তানপুরা that used to be kept at the corner of our drawing room. I don't remember exactly what I wrote but the very fact of having written about the problem, made it almost disappear. That I was able to unburden myself in front of ma itself was the greatest remedy of my restlessness. I don't remember exactly what ma said, but after all that wasn't important either. That she sat with me, talked to me, stroked me, were itself so soothing and comforting that there probably is no place on earth that feels more safe and secured than a mother's lap. And gradually of course, everything settled and came back to normal.

She must have said something along the lines of that she understood, that it was natural, that everything will be fine, that she'll always be there for me no matter what - things she usually comforted me with for all hurdles in life that were to come. And for all those times, ma obviously would be most supportive and caring and somehow I knew I always had her full understanding and sympathy with me, even after I was no longer a little girl, and no matter what situation arose in life.

In fact she'd read me better than I could read myself - and her loving and keen eyes would capture every shade of emotion in me, flawlessly. And whenever I used to express surprise at her impeccable instincts exactly knowing what's going on in my mind, "মা, তুমি কি করে বুঝলে?" she'd smile and say, "দশ মাস দশ দিন তোকে পেটে ধরেছি, আমি বুঝবো না তো কে বুঝবে?" Nothing truly important in life, especially as far as human attachment is concerned, as far as a mother-daughter bonding is concerned, ever changes I guess.

The other day I sensed my daughter looking a bit uneasy. She's ten years and in class 4 and remembering my own experience I asked her to write down if there was something she wanted to share with me. She wrote a letter to me expressing her anguish that she had watched some other videos that she was not supposed to, after her regular cartoon show and didn't feel good about it till she could tell me about them. I don't know whether I could be as good a mother to her as ma was to me, but I did try to talk about it with her and allay her anxieties.

"আমারি দোষ জানিস…" was a line ma often said. If it were something she just said to cover up for mistakes I'd make, it would probably be another motherly quality I guess. But it really was something she'd say to absorb all kinds of blame for anything that probably went wrong. On those rare occasions, when she was probably having to face someone doing something that wasn't supposed to be done, and I would get all enraged about it, she would put herself in the other person's shoes and say something like "আহা, ওর কত কষ্ট ভেবে দ্যাখ, তাই এমন করছে". For those of us who've known her closely, she was kindness personified - almost to the extent of being naive. Not anyone could narrate to her a sorrowful personal story without eliciting her innermost sympathy which often led her to bestow huge amounts of benefits, not all of which even got remembered, leave alone repaid.

There are too many instances to note here which itself will fill up the pages, so I'll just mention a few - once someone said she was giving her son biscuits with water since she couldn't afford expensive baby milk powder and thereafter she used to purchase a bottle of baby milk powder for her and also asked a milkman to deliver milk at their doorstep

everyday. On innumerable occasions, she had helped to open fixed deposits and bank accounts for people working for us, not to mention just giving money to people in need (or even things they desired like a পলা বাঁধানো for our cook or a pressure cooker for her home etc.). In fact I remember, when I was in the US, and asked her what should I bring home, she would usually give me a long list of things to be brought for our maids and chauffeurs and aunts and uncles and cousins, not one thing for herself.

Doing whatever they could for others had become a way of life for both my parents. My parents had been acting as the greatest support to their families, not just in financial terms but also in terms of moral and material support whenever the need arose. For example when my uncle (মামা) was diagnosed with malignant malaria while he was posted in Maldah, it was my parents who arranged for tickets within a day and brought him over here for treatment. Not only that, no one really even had to ask them for anything, it was obvious 'ভাইদি' (my ma) and 'সুদীপ্তদা' (my baba) would do whatever was needed to be done without the slightest delay and without ever thinking that they were doing any favour to anyone. I remember I didn't want to stay behind here and had missed school to go along with them, something they readily agreed to given the circumstance, though missing school at other times, would be completely out of the question.

On another occasion, my father had applied for LTC and we were all set to travel to Rajgir, Nalanda etc. The day before our departure my aunt (মাসি), who wasn't keeping well, was diagnosed with meningitis and had to be admitted to hospital. My parents immediately canceled the trip. (As it happened, we never visited those places again.) There have been numerous other instances when my parents' sacrifices and decisions would act as the mainstay of all our near family. When our entire family was reeling under the shock of the

very sudden and untimely demise of one of my aunts (মামী) who were based in Ranchi, ma had visited and arranged for admission of my cousins in schools in Kolkata after relentless efforts and several visits. She had helped in school admissions for my other cousins as well.

This unadulterated selflessness, kindness and benevolence in ma are reflected in her academic contributions as well. Her selflessness in research - spending long hours, even days visiting remote places in search of manuscripts, when she was younger and her body permitted it - is obviously reflected in the vast majority of books she has on bringing other scholars into limelight. The very fact that she has painstakingly devoted so much time into unearthing works of other scholars and details about their lives, speaks about her benevolent philosophy of life. She has about twelve monographs (on various Sanskrit writers and scholars) out of twenty eight books that she has authored.

In fact the birth of Convergence also owes its origin to her selflessness and kindness in some ways. In fact as a precursor to Convergence, ma had instituted Sudipta Chattopadhyay Memorial Prize (which constituted of a small trophy and a cash reward) to be awarded to needy yet meritorious students. She continued with the grants for two consecutive years, 2016 and 2017. These awards were announced as advertisements in the newspapers, seeking applications from eligible candidates. In spite of her deteriorating eyesight, every year she went through the applications and selected a few students who were awarded these merit-cum-need based awards in a small ceremony at Rabindra Tirtha. And at each of these occasions, she worked hard with an impeccable eye to detail, taking care of the arrangements and logistics of each and every candidate since many of them were travelling from a distance.

And then of course, Convergence came up. “এমন মানুষের pension-এর টাকায় শুধু FD করব?” Her whole idea was to use my father’s pension to generate employment for someone needy, to give access to her books, help less well-off students who can’t afford to learn languages etc., help them learn these at little or no cost to them. She also wanted to use her savings to recognise and felicitate contributions of people to society whose contributions are not generally rewarded conventionally like that of a mother whose son is a doctor or a wife whose husband had been a great scholar and so on. Our society would hardly have a good doctor if his mother had not stood by his hard labour as firmly as she did or a wife did not give the support she did to her spouse to help him hone his talents, no matter how much the talents were. No one understood and appreciated the sacrifices that women silently and smilingly undertake and ordeals they stoically bear, more than ma did.

In a way, she has always been the most loving and devoted wife, the most caring and concerned mother that I have ever seen, and at the same time she has been one of the fiercest and strongest feminists that I have encountered, always standing up women’s rights and helping them in whatever way she could. She has herself given me সুবর্ণলতা and প্রথম প্রতিশ্রুতি and has extensively discussed them with me. She gave me Mandakranta Sen’s হৃদয় অবাধ্য মেয়ে with the words “আমার বাধ্য মেয়েকে হৃদয় অবাধ্য মেয়ে দিলাম” during my study leave before Part 1 Exams. She has been the one who has untiringly encouraged me to publish my poems and stories and to not give up my dancing .

Her life itself has been my greatest teacher. She has always been the guiding force in life. Even when she had to leave me, she tried to prepare me to move on ahead with her last words, to carry on when she’d no longer be by my side. During the first few days after

being admitted in hospital, when she could still talk (before being on ventilation, tracheostomy etc.) she had once said, quoting Tagore:

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই -
সবারে আমি প্রণাম করে যাই…
অনেকদিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি…

In fact, last winter, I had written a poem with the title "Que Sera, Sera" (which literally means "Whatever will be, will be" in Italian) and she said I should believe that and accept whatever happens. "ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে" she had said. At that time I did not know the poem from which ma quoted those lines (obviously her knowledge and erudition were far too deep for my meagre abilities). Later on though I searched and found the whole poem. In between her high-flowing nasal-oxygen, though ma was just able to say two lines, let me still have the rest of this beautiful Tagore poem here, as her final message to us:

বোঝাপড়া
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
কেউ বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ বা বাসতে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে,
কতকটা যে স্বভাব তাদের
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক –
সবার তরে নহে সবাই।
তোমায় কতক ফাঁকি দেবে
তুমিও কতক দেবে ফাঁকি,
তোমার ভোগে কতক পড়বে

পরের ভোগে থাকবে বাকি,
মান্ধাতারই আমল থেকে
চলে আসছে এমনি রকম –
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম!
মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠল কেঁপে আর্তরবে –
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে?
ভেসে থাকতে পার যদি
সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পার তো বিনা বাক্যে
টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো।
এটা কিছু অপূর্ব নয়,
ঘটনা সামান্য খুবই –
শঙ্কা যেথায় করে না কেউ
সেইখানে হয় জাহাজ-ডুবি।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

তোমার মাপে হয় নি সবাই
তুমিও হও নি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে –
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি?
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।

যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে
আঁধার করে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মার,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পার সারো।
খুব খানিকটে কেঁদে কেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া
মনের সঙ্গে এক রকমে
করে নে ভাই, বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো –
ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে
কতটুকুন তফাত হল।
মনেরে তাই কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

আমাদের সুদীপ্তদা

স্বাতী পারেখ

এক একজন মানুষ থাকেন যাঁদের উপস্থিতি ভরসা দেয়,সাহস যোগায় ,অন্ধকার মনে আলোর সন্ধান দেয়। সুদীপ্তদা মানে সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেরকম একজন মানুষ। সদাহাস্য,সদালাপী মানুষ, সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করতেন।

সুদীপ্তদার মতো মানুষেরা দৈহিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও তাঁদের চারিত্রিক প্রভা অন্তরের মধ্যে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। মানুষ মরণশীল। একদিন না একদিন কোন না কোনভাবে এই পৃথিবী থেকে তাকে চিরতরে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু যিনি সৎকর্ম, সৎ আচরণ, সুন্দর ব্যবহার করে থাকেন তাঁদের পার্থিব শরীর বিলীন হলেও তাঁরা ফুরিয়ে যান না। তাঁদের সংস্পর্শে আসা মানুষের জীবনে সুদীপ্তদাদের জীবনাচরণ ভালমতো ছাপ রেখে যায়। সুদীপ্তদার হাস্যময় মুখ দেখা থেকে আমরা বঞ্চিত কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর ভালবাসা আজও আমাদের উজ্জীবিত করে।

সেই কোন ছোটবেলায় আমার কাকুর হাত ধরে সুদীপ্তদার বাড়ি যেতাম। ওঁর বাবা সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কাকু বিনয় ভট্টাচার্য্য রাজনীতি, সাহিত্য, নাটক নিয়ে আলোচনা করতেন। কাকুর পাশে বসে না বুঝলেও সে সব শুনতাম। যাতায়াতের মাধ্যমে ওঁদের পরিবারের সঙ্গে খুব ভাল যোগাযোগ হয়েছিল। সুনীল চট্টোপাধ্যায় ওঁর বাংলায় অনুবাদ করা স্পার্টাকাস বইটি আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। তাঁরই পুত্র সুদীপ্তদা আমার বড় দাদার মতো ছিলেন। ওঁর স্ত্রী ঋতা চট্টোপাধ্যায় আমার কলেজ জীবনের কয়েক মাসের শিক্ষিকা। অল্প সময়ের জন্য শিক্ষিকা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে জীবনভর আমি ঋতাদির স্নেহ পেয়েছি, যা আমার জীবনে পরম প্রাপ্তি। সংস্কৃত কলেজে পড়াকালীন ওঁর সাহায্য আমাকে সংস্কৃত পাঠে উৎসাহ দিয়েছে।

পরবর্তী জীবনে যে কোন সমস্যা উপস্থিত হলে ওঁদের মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। আমার চাকরি জীবন শুরু হয় 'ক্যালকাটা টেলিফোন্সে' যা এখন 'বি এস এন এল' নামে পরিচিত। তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সুদীপ্তদা বলেছিলেন এখনি চাকরিতে ঢুকে গেলে উচ্চশিক্ষা করা সম্ভব হবে না। সত্যিই তাই -- এম ফিল পর্যন্ত কোনরকমে করতে পেরেছিলাম, গবেষণার পথে আর যাওয়া হয় নি। কিন্তু আমার দিন শুধু চাকরির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি; তা সুদীপ্তদা ও ঋতাদির কারণেই। অফিসের একঘেয়েমি কাজের মধ্যে থেকেও ঋতাদি বারবার আমাকে সারস্বত জীবনের ছোঁয়ায় রেখেছেন।

বি এস এন এলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন সুদীপ্তদা। Chief General Manager পদে উন্নীত হলেন, তখন শরীর অতীব খারাপ। তবু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসনিক কাজ করে গেছেন। বি এস এন এলের সার্বিক উন্নতির কথা চিন্তা করেছেন। অফিসের উচ্চ-নীচ প্রতিটি কর্মচারীদের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ও জনপ্রিয় ছিলেন। ইউনিয়নের নেতা-নেতৃরা নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে আলাপ-আলোচনা করতে আসতেন। একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবকের মতো তিনি সুপরামর্শ দিতেন, সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে ওদের অভিযোগ, ক্ষোভ দূর করে একটা সমাধানের পথ বের করতেন।

সুদীপ্তদার অকালপ্রয়াণে প্রত্যেক কর্মচারী যেন অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছিলেন। অফিসে অন্যদের বলতে শুনেছি 'ইস আজ যদি সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় থাকতেন, বি এস এন এলের আরও উন্নতি হতে পারত, এভাবে দিনে দিনে অবনতির পথে যেত না। একজন সুদক্ষ আধিকারিকের দক্ষতায় কোম্পানির উন্নতি অবশ্যই হয়। কর্মচারীদের মধ্যে কতটা বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পেরেছিলেন যে তারা আফশোস করে সুদীপ্তদার না থাকার জন্য।

আমাদের বিএস এন এলের কর্মীরা যেমন মনে করে যে ওঁর মতো দক্ষ ও মানবিক অফিসার পাওয়া দুর্লভ, তেমনি আমরা সাধারণ মানুষেরাও মনে করি সত্যিই সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতো সৎ এবং সহানুভূতিশীল মানুষ এ যুগে দুর্লভ।

The Medical Fraternity - The Untold Tales of Unkindness and Kindness

Soumyanetra

My mother is no more with us. She passed away after being admitted for almost two and a half months in the ICU of one of the 'best' private hospitals in Kolkata. I know people come with a longevity that is not destined to be changed. This piece is not a complaint against the fact that ma passed away - rather it is an outlet to express the kind of unkindness and inhumanity that I have faced during this past few months on one hand, as well as, kindness and sympathy from unexpected quarters, within the medical fraternity of the hospital.

Ma complained of breathing distress when I returned from office on 2nd June, Thursday, evening. We checked that her oxygen saturation was around 87/88. We tried getting her admitted in what is popularly believed to be one of the best private hospitals in Kolkata, but there was no ICU bed available there, so she had to be admitted in another nearby reputed private hospital. The doctors at this hospital never sounded very confident about the diagnosis and her breathing distress kept on increasing. So on 6th June, Monday, after four days, when an ICU bed became available in the 'best' hospital, we decided to shift her there. On 7th June, Tuesday, morning, her pulmonologist, under whom she was admitted, while showing me the plate of her CT scan (as if I'd read and understand the plate) said that her kidneys weren't functioning well and because of that there was fluid accumulation inside the body, including in lungs, causing pneumonia. That two-thirds of her lungs were 'consolidated' (means couldn't breathe) and kidneys were shutting down because of the lung infection. He concluded by saying "এই patient আর কতদিন টানবে?"

In a way, the blow was punched, the jolt felt. My mother, who walked into the hospital a few days earlier with breathing distress will probably not be here anymore. And the matter-of-fact manner in which the news was delivered was no less of a jolt - here a doctor, who has been helplessly called upon to cure the disease of an elderly woman, was delivering the death sentence of a mother to a daughter, and there wasn't a trace of kindness and sympathy in his voice or demeanour. And in a way, I am rather sceptical of exactly how grave the situation was, given we had been to Apollo Chennai the week before to consult a renowned nephrologist who we used to video consult earlier. He had examined my mother physically with stethoscope but said no such thing. Even doctors at the previous hospital never said anything nearly as pessimistic and hopeless.

In the afternoon the next day, they called a 'board meeting' in the presence of the Medical Superintendent himself, his assistant Superintendent doctor, ma's treating pulmonologist, his junior assistant doctor, doctor in charge of the ICU in which ma was admitted, and the nephrologist, referred to by the pulmonologist. All of them surrounded me and probably assuming I was someone who would not understand English, I was explained how 'multi' means 'more than one' and since my mother's lungs and kidneys were affected, she is having 'multi-organ' failure and at this age, given her diabetes (which means she is 'immuno-compromised', her immunity is nil) chances of her recovery seem rather bleak. The junior doctor acted more like a note-taker and it was his duty to meticulously write out what his 'Sir' said and get it signed from me which he did on that day, and thereafter on all the days while ma was admitted there.

Ma's respiratory distress kept on increasing, and doctors, who kept saying 'she might have to be put on ventilation' right from the beginning, put her on ventilator on 10th June, Friday.

On 13th Monday they said, they would drain out fluids from both the lungs. On 15th Wednesday, in the small room just opposite my mother's ICU ward, called a 'counselling room' that had a small sofa, two chairs and a table, and where the doctors usually met me to apprise me of ma's developments, her pulmonologist, along with his retinue of junior doctors, once more met me and explained to me about EOL procedures (also known as palliative care). EOL stood for End of Life. EOL procedures mean, since my mother was not responding and showing any improvement in spite of optimal treatment, they recommended stopping all active treatment and just making sure her end would be 'painless'. So no more aggressive investigations (ventilator support can't be withdrawn because that is illegal in India), and she will just be cleaned, fed by Ryle's tube like now and her body treated with dignity till she is no more. Of course the decision was mine and I had to give my consent before they would start ma on it. I could only manage to ask, "when do you think we ought to start with EOL?" to which the pulmonologist said, "had she been my family member, I would start right now".

I remember, in spite of my grief, I was hit by how icily and easily the doctors could surround a daughter and speak of such things, barely a week after I brought my mother for treatment to get better. Later on, as these daily doses of unkindness were to continue for the next couple of months, I had once gathered the courage to say that they are just talking from a medical perspective while I was listening to all this from the perspective of a daughter about to lose a mother. And the reply was "we are trained to be non-emotional". My mother being a professor of Sanskrit and having closely worked on Ayurveda and Charaka Samhita, would often talk about the defining characteristics of a good doctor. And compassion and kindness were uppermost amongst them. Strange that we were at the best hospital, under the treatment of best possible doctors and yet basic human feelings were at such a premium. I did not sign the EOL consent.

As if to prove her doctors wrong, and as if unable to bear such harshness on her daughter, ma started coming back to consciousness immediately from the day after, around 16th June, Thursday. So the next day doctors said they were putting EOL on hold since she was showing signs of response and would continue with her treatment. They said this as matter-of-factly as they had told about starting EOL procedures - not the slightest sign of relief or happiness because their patient was slightly better.

On 17th June her pulmonologist said he was going on leave for five days, his junior assistant would be the point of contact and that he will not even be available on phone. Also since it has been a week of being put on ventilation (which meant a tube was inserted through her mouth upto her lungs), this would injure her trachea and so they needed to do tracheostomy, so that she won't be able to talk. But that it wasn't permanent and she could talk again once the tracheostomy was closed. On 18th June they performed tracheostomy on her (which meant she was now breathing through the tube inserted in her throat). Also she was started on dialysis in the meantime since her kidney function had worsened.

In spite of what the doctors said, ma kept on thoroughly improving. When her doctor returned after five days, she was markedly better than when he had left, but as usual, he only said something like 'there is no improvement from yesterday', not that 'there has been substantial improvement from five days back', not that 'she has proved us wrong, fought back from EOL, and come back to us', not that 'she has fought bravely, done very well, and we want to help her get well'. Even though she could not speak she would try to write. And ma made every possible effort to get well - she would ask about her students, about Convergence (an academic-cum-philanthropic organisation that she started in the memory of my father), her colleagues, my cousins and even about our chauffeur. Later the junior

doctors had said things like ‘it was a miracle how she came back’, ‘only a few, if any at all, patients came back from how she was’, ‘she has travelled a long way from EOL”, etc. Yet none of the senior consultants made any sustained effort to keep up this miracle.

They turned off her ventilator support abruptly on 26th June. Initially they said, they’d switch it off for a few hours, then keep increasing the hours till it’s completely turned off, giving time to the lungs to breathe on its own again. However, no such thing was followed and I just found the ventilator switched off on Sunday 26th June, while she was requiring about 6 litres of oxygen per minute. On Wednesday, 29th June, I asked her doctor about at least shifting her to HDU (High Dependency Unit), but he completely turned it down saying, “পাশের ward এ patient দের দেখেছেন - কিরম condition ওদের? আপনার মাকে দেখেছেন?” However, and most surprisingly, the very next day, June 30th, he said, the patient was ready for discharge from their end and we have to talk to the nephrologist about dialysis and other needs.

It’s been almost a month in ICU and ma and I were overjoyed at the prospect of going home. I arranged for full ICU arrangements at home, and waited to consult her nephrologist regarding dialysis. That afternoon, when her nephrologist came, I literally begged him to tell me of how we might continue her dialysis after discharge - where might we take her in an ambulance with oxygen support etc. All he said was “ধারে কাছে কোনো monitored bed এ নিয়ে যাবেন, কোনো nursing home, hospital এ… dialysis ছাড়া patient সাত দিনও survive করবে না ”. Strange, but why did he think I would keep ma without dialysis for seven days, when I knew she need dialysis every two to three days? That ma was his patient, that he was responsible for her well-being didn’t seem to be his concern at all.

That we were discharging her meant she was solely our responsibility and he wouldn't even suggest a place for her dialysis after discharge.

Ma had her dialysis scheduled for that day, 30th June, that continued way past midnight, till about 2:30am, and we brought her home in the wee hours of the morning of July 1, Friday, thinking our ordeal would begin to get over, and ma would begin to recover. She used to get dialysis with a gap of every two to three days, so we knew her next dialysis was scheduled by Saturday, 2nd July, or Sunday, 3rd July. We made an appointment with the nephrologist in charge of a nearby hospital (as suggested by her treating nephrologist) and took her with oxygen support in the ambulance to see him on Sunday, 3rd July, morning. This doctor said he was the classmate of her treating nephrologist in the 'best' hospital, checked ma, and said there was no requirement of dialysis (took blood sample for measuring creatinine etc.) and sent us home. That evening I wrote an elaborate WhatsApp message to her nephrologist (of the 'best' hospital) with a copy of the prescription of the nephrologist of the nearby hospital who didn't recommend dialysis, requesting his intervention or at least to have a word with him (his classmate) to assess ma's situation and decide on dialysis. His one-worded curt reply was 'ok' with no indication of whether he has talked to him, whether they would give her dialysis or not and when if at all. By Monday, 4th July, evening, ma's breathing distress which was always there even after discharge, increased manifolds, she began desaturating (oxygen saturation began falling), and we had to rush her to the 'best' hospital's Emergency ward where she had to be put on ventilator support again.

This whole episode of suddenly being given a discharge by the pulmonologist (who refused to shift her to a less critical ward the day before), the nephrologist totally abstaining from extending any help with dialysis outside and coming back to the folds of

the hospital within a couple of days, definitely doesn't speak very highly of the concern and care of the treating physicians in the 'best' hospital.

While in Emergency she was given dialysis overnight and she seemed to be much better. Her scan the next day also showed improvement in her pneumonia patch in the lung. Thursday, 7th July she had her next dialysis. Thereafter, without any intimation, her treating nephrologist went on leave, which we discovered when we saw another senior nephrologist coming to see ma. As it turned out, around Sunday, when her dialysis became due, this new nephrologist wouldn't recommend dialysis and ma was visibly feeling restless. Her senses seem to be much worse and I tried to helplessly contact her original nephrologist to try and put in a word for her dialysis with her new nephrologist. He wouldn't receive calls and his only reply was "talk to the pulmonologist". All that the pulmonologist said was, "we cannot interfere with nephrology". So it turned out that ma, caught between doctors, in spite of being very much admitted in the 'best' hospital (this time she wasn't discharged and brought home and taken to some other 'nearby' hospital), did not receive dialysis when she needed it and she kept getting worse and the senses deteriorated.

They kept doing several other tests for brain etc., and by next Wednesday, which was almost a week after her last dialysis, her pulmonologist confirmed that her brain etc are fine and her distress seem to be related to 'metabolic encephalitis' (toxicity in the blood), and yet they are helpless about giving her dialysis, to which, desperate as I was, I proposed whether we can consult some other nephrologist, to which they agreed and thankfully the new nephrologist recommended her dialysis and she started improving. Caught between nephrology and pulmonology, ma was denied a much-needed dialysis for

almost a whole week, in spite of being admitted in the ICU of one of the ‘best’ hospitals. By whose fault? Someone must have been responsible for ma - who was it?

Ma’s health teetered between slight improvement and worsening and her pulmonologist, on the days she would be a little better, would say things like, “আপনাদের রোগী তো ভালোই আছেন, কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন there is no light at the end of the tunnel”, or things like “দেখছেনই তো এক পা এগোচ্ছেন তো দু পা পেছোচ্ছেন”.

During her short stay in the Emergency ward, I happened to hear the kind words of another very prominent doctor and I wished he would see ma once. I gathered up the courage and went to his chamber and my experience with him actually turned out to be diametrically opposite to the experiences that I have had with the other physicians till then. An extremely busy doctor, where patients usually had waiting time of 3 to 4 hours for consultation with appointments taken months earlier, showed such kindness so as to talk to me in his chamber - without any prior appointment whatsoever. He patiently listened to my whole plight and made some suggestions by calling some other physicians. When I thanked him, he politely replied “আপনি আমায় thanks কেন দিচ্ছেন আমি তো আপনার মা'র জন্য এখনো কিছুই করিনি”, and on my request even went and saw ma, and suggested treatments. Ma’s new nephrologist was also a very kind soul and he spoke of setting up dialysis unit at home while thinking of discharging ma at some point in future. Both these doctors were like beacons of hope in a sea of hopelessness and unkindness. However, her treating pulmonologist did not take very kindly to advice from them and said things like “এদের উঁকি ঝুঁকি মারতে বারণ করবেন”.

Well, to cut a long story short, ma was detected with a blood infection and her health condition steadily deteriorated. During her last few days, she started bleeding massively and in spite of four endoscopies, colonoscopy, CT etc., doctors couldn't identify the source of bleeding or stop it. She required about 50 units of blood within a few days and her haemoglobin had dropped to around 2. Her pulmonologist would say things like "এরম blood দিয়ে prop up করে আর কতদিন চলবে…" . And he suggested EOL once more. I requested him to please help me arrange for whatever ma needed at home - I would very much like to take her home and let her pass away with us by her side. To which he replied, "এরম patient নিয়ে যাবেন কি করে, ventilation e, blood চলছে etc…". The very next day though, he said we should take her home and let her pass peacefully. So I asked him how will I manage her blood requirement etc at home, to which he said something like "blood etc লাগবে না, শুধু নিয়ে গিয়ে বিছানায় ফেলে রাখবেন, চারিদিকে ঘিরে থাকবেন till she passes away". If I did bring her home this way, with none of the support that she needed, I would ensure that she passed away, wouldn't I?… It would be tantamount to killing her. Well, ma did not suffer for too long after this and passed away in the wee hours the very next day.

For two months ten days, she fought the most remarkable battle and for me, performed miraculously well. She could not eat, or speak, or move around, her body was completely covered with painful perforations of tubes and channels and it was hard to see her bear the unimaginable physical suffering. Yet she still managed to smile when she saw me and ask (by indications whenever she could) about her friends, students and colleagues.

Junior doctors, nurses, security guards, ward boys, dieticians, people in the administration- all showed sympathy and kindness. But the person on whom we have all been banking the most did not have the heart to at least once say "আপনি ভালো হয়ে যাবেন". People hear of

mental strength, emotional strength doing wonders - who knows whether my mother would have fought her battle better, would have lived for a few more days, if the doctors she depended on, who she would eagerly look forward to meet, would have been a little more positive. Her hope and optimism in the face of utmost physical suffering hung on the response to “হ্যাঁ রে ডাক্তার কি বললেন?”, and the doctors did not have the heart to respond positively to her earnest desire to live.

My mother has been an erudite scholar and people in her domain of research lament of an irreparable loss to the world of oriental studies. There are condolence prayers and meetings in not only the universities she has served as a professor but also various other libraries and academic institutes, even outside the state. Her academic absence only compounds the sense of vacuum that confronts me, and adds fuel to the fire of the suffering that the unkind behaviour of some of the doctors had subjected us to. And possibly their unkindness itself turned out to be the self-fulfilling prophecy of ma being no more - had they been positive from the beginning, maybe ma would have fought better and maybe we would have looked at a brighter future - had they believed that there was light at the end of the tunnel, maybe there would be, who knows.

Ma’s journey with us ended. I understand that it is hard taking decisions in life, especially in the medical profession where lives depend on it. But in ma’s case, most of the decisions seem to be taken with a lot of false vanity and misplaced ego on the part of the doctors, that prevented them from reaching out to the patients and their close ones. Their behaviour should have been the fountain of hope and strength or at least comfort and solace, even if the outcome which happened ought to have happened, which may not be in the first place, had their attitude been more positive.

I have lost my father to lung cancer thirteen years back but the memory of the loss doesn't jar with this kind of cruel harshness. Ma was of course there with me, but even otherwise, the entire medical fraternity in that hospital seemed to be party to the loss, grieving with us in our loss, standing in solidarity with our feelings and lending us much needed sense of 'having done the best in the best possible way' for baba, so that there was no place for any regrets. In ma's case, we probably got the best possible treatment, medicine and facility wise, but there's been a yawning distance as far as fulfilment of emotional and psychological support and motivation is concerned, both for the patient and her near ones. "দুবেলা মরার আগে", they killed my ma several times over before she actually passed away.

আধুনিক সংস্কৃত কথাসাহিত্যের অন্যতম কথাকার বীণাপাণি পাটনীর "অপরাজিতা" শীর্ষক গল্পগ্রন্থের কথা-পঞ্চকে নারীচরিত্রে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ও নারীচৈতন্য জাগরণের আলেখ্য চিত্রণঃ এক সামান্য সমীক্ষা

অর্পিতা সিংহ চৌধুরী

সার-সংক্ষেপ:

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখক বা কথাকার তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করার সুযোগ নিশ্চয়ই পান। কারণ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর উপন্যাস বা ছোটগল্পের প্রধান প্রেরণা, তবে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে একথা আরও গভীরভাবে সত্য। একথা সংস্কৃত লঘু কথাগুলির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

কারণ ছোটগল্প মূলত অনুভূতিমূলক। কবির যে অনুভূতি কথাকার বা ছোটগল্পকার তা সম্প্রসারিত করেন তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে, এইটুকুই পার্থক্য। অনুভূতির ওপর মহৎ ছোটগল্পকার এতোখানি গুরুত্ব আরোপ করেন বলেই ক্রোচের মতো দার্শনিকও মপাসাঁরগল্পে গীতিকবিতার স্পন্দন শুনতে পেয়েছেন। "Poetry and Non poetry" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন- **"The lyric is really intrinsic to the form of the narrative and shapes each part of it, without mixture and without having any residue."**[1]

আমাদের আলোচ্য 'অপরাজিতা', 'কুলীনা', 'শঙ্খনাদঃ', 'বাতায়নম্', 'অনুগৃহীতা'- বীণাপাণি পাটনীর লেখা এই পাঁচটি কথা বা ছোটগল্প। এই গল্পগুলিতে যথাক্রমে নানারূপে নানাভাবে নারীচরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ও বিকাশ লক্ষণীয়।

সূত্রনির্দেশ :

[1] সাহিত্য প্রকরণ- হীরেন চট্টোপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৪০২, পৃ.- ২৩০-২৩১

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে বীণাপাণি পাটনী এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত জানকীদেবী মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা। বীণাপাণি দেবী বিরচিত অন্যান্য যে গ্রন্থগুলির কথা জানা যায়, সেগুলি হল- “শ্রীকৃষ্ণকথা” (২০০০), “মধুরাম্লম্” (১৯৮৬), “নিম্বপত্রাণি” শীর্ষক নাট্যসংগ্রহ, “The Epics : Missing Links” (2009), ইত্যাদি। তাঁর ‘মধুরাম্লম্’ গ্রন্থের নাটকগুলি হল- ‘নিম্বপত্রাণি’, ‘প্রতিবুদ্ধা’, ‘যাথার্থ্যপরলম্’, ‘নারদদৌত্যম্’, ‘কবিকালিদাসম্’।

নারী সমাজ ও সমাজে নারীর সংকটাবস্থা তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। তাঁর লেখা গল্প ও নাটকে বার বার আমরা নারীজীবনের চিত্র দেখতে পাই। আমাদের আলোচ্য তারঁর ‘অপরাজিতা’ শীর্ষক গ্রন্থের কয়েকটি লঘুকথা বা ছোটগল্প- যেগুলিতে মূলতঃ নারীজীবনের সুন্দর আলেখ্য সুনিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন লেখিকা। তাঁর লেখা নাটক ও ছোটগল্পে উঠে এসেছে কর্মরতা মহিলাদের কর্মস্থল ও সংসার পরিচালনায় নিষ্পেষিত অবস্থা, পুরুষের প্রবঞ্চনায় নারী জীবনের সংকট ও সেই সঙ্গে আত্ম-নির্ভরশীলতার অপূর্ব চিত্র। যা আমাদের শুধু অনুপ্রাণিতই করে না, পরিতৃপ্ত করে আমাদের অন্তরাত্মাকে। এবার চলে আসি আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির সমীক্ষায়।

আমাদের আলোচ্য গল্পগুলি হল- ‘অপরাজিতা’, ‘শঙ্খনাদঃ’, ‘কুলীনা’ ‘অনুগৃহীতা’ ও ‘বাতায়নম্’।

প্রথমেই আসে তাঁর “অপরাজিতা” গল্পগ্রন্থের ‘অপরাজিতা’ গল্পটির কথা।

অপরাজিতা (অপরাজিতা, দিল্লি, ১৯৯৪)

“অপরাজিতা” শীর্ষক গল্পটি প্রায় কুড়ি পাতা ধরে রচিত বিজয়া নামের এক কর্মরতা নারীর আলেখ্য তুলে ধরেছে আমাদের কাছে। এ গল্পের বিজয়া বর্তমান বা বলা ভালো আধুনিক যুগজীবনের এক দীপ্তিময়ী নারীচরিত্র। লক্ষ্মণ পাল ও শান্তির কন্যা বিজয়ার বিয়ে হয় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। কিন্তু সে সেখানে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে ও পথ দেখায় সমস্ত নারীসমাজকে।

(Continued on page 109)

On my annaprasana (1981)

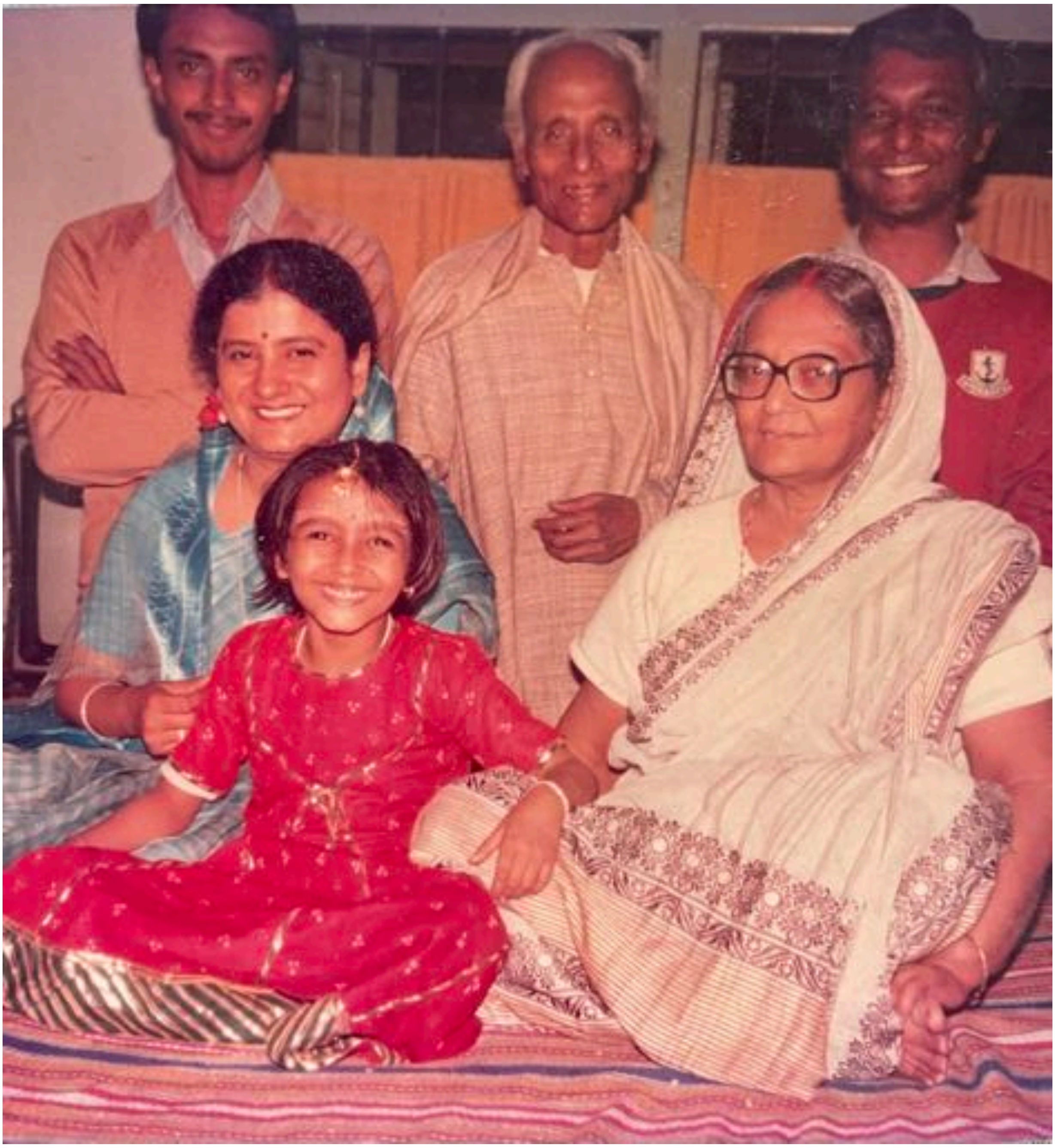

On my seventh birthday (1988), along with my paternal grandparents, kaku and baba

Presenting her paper the World Sanskrit Conference in Vienna August 1991

Saree-clad, striding smartly and in style (Vienna 1991)

Loving mother even when traveling abroad
(while returning from Vienna 1991)

In our 430-square-feet flat near Sribhumi - but she always felt on top of the world!

One of her many academic presentations

On Parvati masi's son's annaprasana, at Parvati masi's in-laws' house in Agarpara, 2002
(Thanks to Parvati masi for sharing this photo)

In Puri January 2020

In May 2022

In May 2022

জাতীয়স্তরের আলোচনাচক্র

"শতবর্ষের সাহিত্য : বাঙালী মনীষা”

April, 2018, Gandhi Bhavan Jadavpur University

On the occasion of release of her book

আধুনিক সংস্কৃত কাব্য: বাঙালী মনীষা

শতবর্ষের আলোকে

Nabanita Dev Sen gracing the occasion

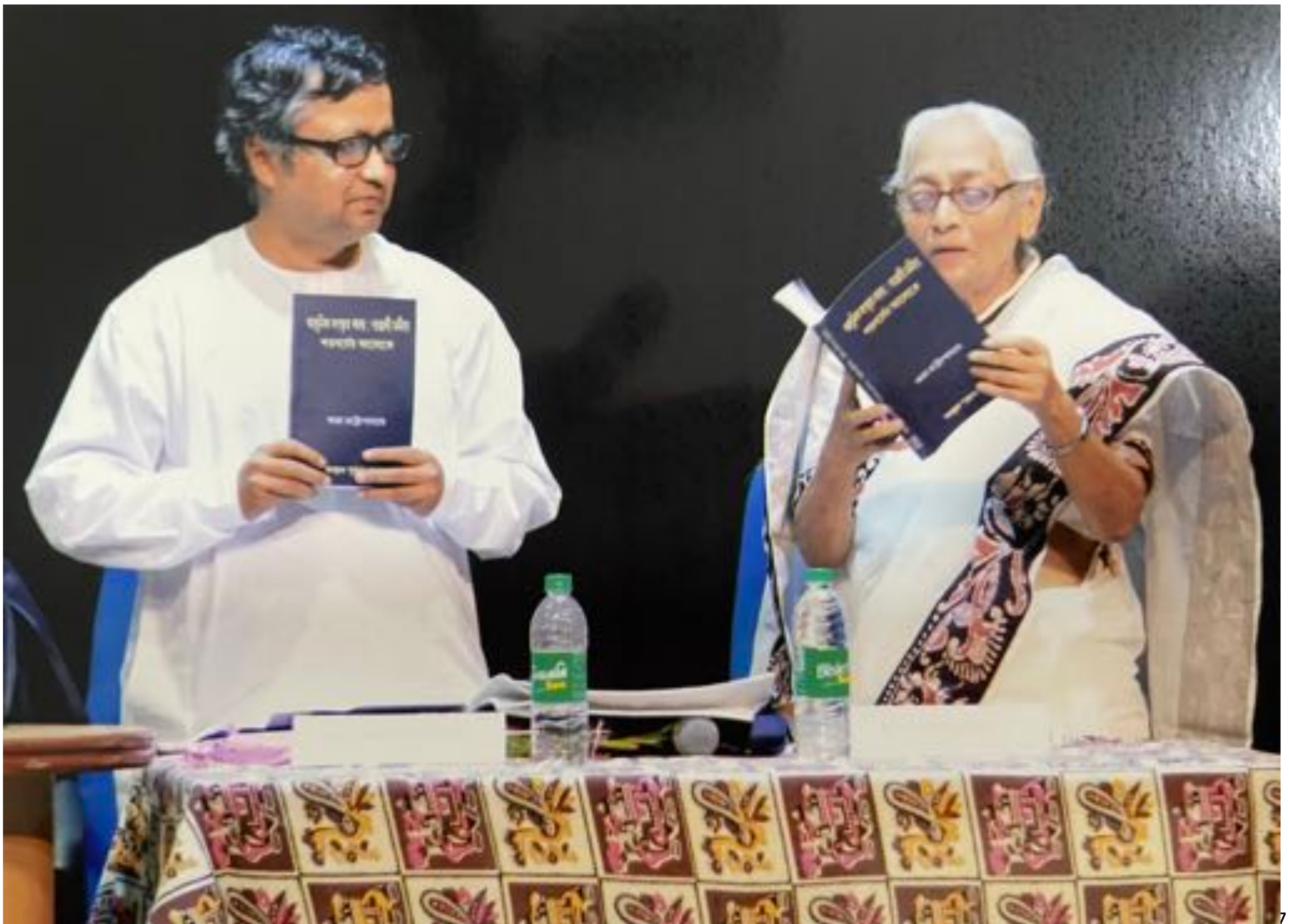

On the occasion of release of her book

সীতানাথ আচার্য: কবি ও প্রাবন্ধিক

১৯২০
স্থাপিত
সংস্কৃত বুক ডিপো
কর্তৃক
বই প্রকাশ
সীতানাথ আচার্য্য: কবি ও প্রাবন্ধিক
K.L.&SONS

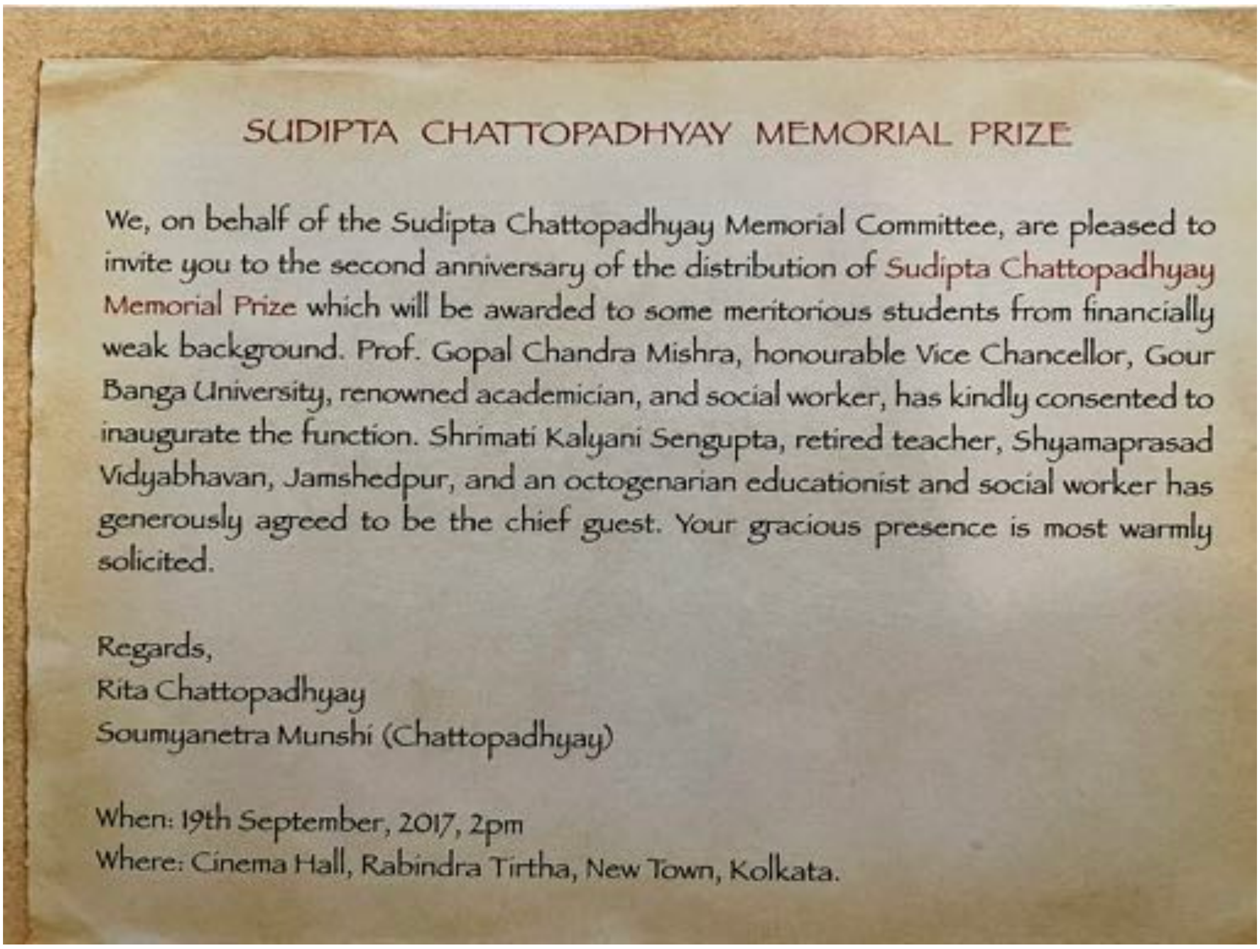

SUDIPTA CHATTOPADHYAY MEMORIAL PRIZE

We, on behalf of the Sudipta Chattopadhyay Memorial Committee, are pleased to invite you to the second anniversary of the distribution of Sudipta Chattopadhyay Memorial Prize which will be awarded to some meritorious students from financially weak background. Prof. Gopal Chandra Mishra, honourable Vice Chancellor, Gour Banga University, renowned academician, and social worker, has kindly consented to inaugurate the function. Shrimati Kalyani Sengupta, retired teacher, Shyamaprasad Vidyabhavan, Jamshedpur, and an octogenarian educationist and social worker has generously agreed to be the chief guest. Your gracious presence is most warmly solicited.

Regards,
Rita Chattopadhyay
Soumyanetra Munshi (Chattopadhyay)

When: 19th September, 2017, 2pm
Where: Cinema Hall, Rabindra Tirtha, New Town, Kolkata.

(Continued after page 87)

এই গল্পেই আমরা লক্ষ্য করি, বিজয়ার মা শান্তি দেবী ও বিজয়ার কথোপকথনে সমাজে ও সংসারে নারী-পুরুষের অবস্থার পার্থক্য। তার মা তাকে তার বিবাহপ্রস্তাব সম্পর্কে জানান- তাঁর কোনো মতামত নেই সেই বিষয়ে। বিজয়া তার মাকে বয়লে- **"মাতঃ! তব কো নির্ণয়ঃ?"**[2] তার মা কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেক জানান- **"পুত্রি! তব পিতুর্নির্ণয় এব মম নির্ণয়ঃ।"**[3] এ কথা শুনে বিজয়া আবারও তার মায়ের মত জানতে চায়। তখনও তাঁর উত্তর- **"জাতে! ত্বং জানাস্যেব যস্মাদ্বিধসমাজে যোষীতাং কিমপি মতং ন ভবতি। মতং তু কেবলং পুরুষাণামেকাধিকারঃ। নার্যস্তস্য মতস্য পালিকাস্তেষাং নিত্যানুগামিন্যো চ ভবন্তি।"**[4] অর্থাৎ সংসারে মতদানের অধিকার শুধুমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রেই বর্তায়। নারীদের মতদানের কোনো স্থান নেই। কিন্তু এই গল্পের নায়িকা বিজয়া সার্থকরূপেই অপরাজিতা। সে সংসারে দৃষ্টময়ী এক নারীসত্তা। তাই তার দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় পাই আমরা পুরো গল্পটি জুড়েই। তাই তার পণলিপ্সু শ্বশুরবাড়িতে তার স্বামী রাকেশের চিঠি পেয়ে যখন তার পিতা লক্ষণবাবু এসেছেন সে সময়ও বিজয়ার দৃঢ়কন্ঠে প্রতিবাদ- **"তাত! ত্বমিদং ধনমেতেভ্যো ন দাস্যসি। অস্মিন্ ধনে এতেষাং নাস্ত্যধিকারঃ।"**[5] তখন তার বাবা তাকে বলেন যে, এটা তাঁর আর তাঁর সম্বন্ধীদের ব্যাপার- এ বিষয়ে সে যেন কিছু না বলে। তবুও বিজয়া জানায় যে, সে তার কর্মস্থল থেকে বেতন পেয়ে তার শ্বশুরের অর্থলিপ্সা দূর করবে। কিন্তু তার বাবা তাতেও সম্মত না হলে সে বয়লে- **"ন হি পিতঃ। যদি ত্বমিদং ধনং দাস্যসি তর্হ্যহং কদাপ্যস্মিন্ গৃহে ন বৎস্যামি। এষ মে দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।"**[6] এই গল্পের

---

[2] অপরাজিতা- বীণাপাণি পাটনী, ১ম সং. ১৯৯৪, পৃ.- ৭

[3] তদেব।

[4] তদেব।

[5] তদেব, পৃ.- ১৮

[6] তদেব, পৃ.- ১৯

নায়িকা বিজয়ার এই উক্তিগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা'র নিরুপমার কথা। তার সেই উক্তি**- "টাকা যদি দাও তবেই অপমান।"**[7]

আলোচ্য গল্পের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে বিজয়া শাশুড়ির কথার প্রেক্ষিতে তার স্বামী রাকেশকে বলে- **"বিবাহে ভবতা মম হস্ত গৃহীত আসীৎ, তস্য পবিত্রবন্ধনস্য শপথং কৃত্বা পৃচ্ছামি, ভবান্ ময়া সহ পৃথগ্ বৎস্যতি?"**[৪]- এই কথাগুলোয় তার চরিত্রের মধ্যে সোচ্চার প্রতিবাদ ও তীব্র অধিকারবোধের চিত্র দেখতে পাই আমরা।

পরিশেষে সে তার পিতার উদ্দেশ্যে বলে- **"ভবান্ গচ্ছতু গৃহম্। মাত্রে নিবেদয়তু সুখীঽমিতি।"**[9] তার নয়ন দুটি জলে ভরে ওঠে আর সে নিজের স্ত্রীধন নিয়ে, সবাইকে প্রনাম জানিয়ে বলে- **"অহমাত্মনো স্ত্রীধন সহৈব নীত্বা গচ্ছামি।"**[10] তার এই উক্তিতে আবারও মনে পড়ে যায় গানের সেই পঙক্তিগুলি- **"ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি, রাখি না আর ঘরের দাবি।"** কিন্তু সেই সময়েই গল্পে দেখতে পাই চরম নাটকীয় মোড়- বিজয়ার স্বামী রাকেশ বলে- **"বিরম, কিঞ্চিদ্বিরম। অহমপি সম্প্রাপ্তোঽস্মি"।**[11] আর এখানেই গল্পটিতে নায়িকা বিজয়ার দৃঢ়চেতা, সাহসী, অপরাজেয় মূর্তির জয়। তাই একথা বলা যেতেই পারে লেখিকা বীণাপাণি তার এই সপ্তকথাসমন্বিত "অপরাজিতা" গল্পগ্রন্থে নায়িকা বিজয়াকে দিয়েই প্রথম আমাদের নারীকুলকে মাথা উঁচু ক'রে আত্মসম্মানের সাথে সংসারে অধিকার বজায় রেখে জীবনপথে এগিয়ে চলার দিক প্রদর্শন করালেন। তাই এই প্রসঙ্গে বলা যায় এই গল্প তথা গল্পগ্রন্থের নাম সার্থক। এই গ্রন্থেরই আরেকটি গল্প 'শঙ্খনাদঃ'। এবার আসি এ গল্পের আলোচনায়-

---

7 গল্পগুচ্ছ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সর্বশেষ সং. বৈশাখ, ১৪০৫, পৃ.- ১৪

8 অপরাজিতা- বীণাপাণি পাটনী, ১ম সং. ১৯৯৪, পৃ.- ১৯

9 তদেব, পৃ.- ২০

10 তদেব।

11 তদেব।

শঙ্খনাদঃ (অপরাজিতা, দিল্লি, ১৯৯৪)

লেখিকা বীণাপাণি পাটনীর 'শঙ্খনাদঃ; গল্পটি নারীসত্তা তথা অন্তরাত্মা জাগরণের কথা প্রকাশ করে আমাদের কাছে। গল্পের শুরু হয় হিমগিরির চম্পাপ্রদেশের নৈসর্গিক বর্ণনা দিয়ে। সেখানে রক্তাভ রবির কিরণে প্রকৃতি সমুজ্জ্বল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। সেখানকার সুমন্দ সুগন্ধি বাতাস শরীর ও মনকে যেন পবিত্র ক'রে তোলে। নিসর্গের এই অপরূপ চিত্র তুলে ধরার পরই গল্পরচয়িতা আমাদের নিয়ে যান গল্পের মূলে- এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণের সময়ই লেখিকা জানতে পারেন গ্রামের সেবকদের কার্যালয়ের পেছনে ভাগীরথী নামের এক মহিলা থাকেন। লম্বাকৃতি, গৌরবর্ণা, দুর্বলকায়া সে। তার চোদ্দ বছরের মেয়েকে নিয়ে সে আসে লেখিকার ঘরে। তখন তার আত্মবৃত্তান্ত শোনেন লেখিকা।

ভাগীরথী এমন এক নারী যে নিজের মুখেই জানান দেয় তার 'বিশিষ্টং দৌর্ভাগ্যম্'।[12] সে কৈশোর ও যৌবনকালে জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, শুধু তাই নয় লেখাপড়া করার ইচ্ছা সত্ত্বেও সেই অধিকার সে পায়নি পিতৃগৃহে। সংসারের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে তার ভায়েরা। সে মেয়ে বলে সবকিছু থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। পিতার মৃত্যু হলে তারপর তার বিয়ে হয় এমন এক মানুষের সাথে যে মদ্যপ। ভাগীরথী তার ভাইয়ের কাছে একথাও শুনেছে যে, সংসারে নারীদের গতিনির্ণয় করে পুরুষেরা। সুতরাং 'স্বতন্ত্রনির্ণয়' বা স্বমত প্রকাশের কোনো স্থান নেই সেখানে। ভাগীরথীর সংসারজীবনও সুখের হয়নি কোনদিন। রাতে স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে সে অপেক্ষা করেছে কিন্তু মদ্যপ স্বামী এসে তাকে তিরস্কারই করেছে- শুধু তাই নয়; অত্যাচারও সইতে হয়েছে তাকে। কিন্তু একদিন সে তার সমস্ত সহিষ্ণুতা ত্যাগ করে। তার অন্তরে কে যেন শঙ্খনিনাদিত করে! সে দুটি চিঠি লেখে- একটি তার স্বামীর উদ্দেশ্যে আর অন্যটি শ্বশুর-শাশুড়ির উদ্দেশ্যে। আর তারপর তার স্বামী আসার আগেই সে স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি ছেড়ে। জম্মুনগরে রঘুনাথ মন্দিরের কাছাকাছি এক ধর্মশালায় কয়েক মাস কাটায়। সেখানে কয়েকজন ভদ্র মানুষের সাহায্যে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে শিল্পকলা শেখানোর

---

[12] অপরাজিতা- বীণাপাণি পাটনী, ১ম সং. ১৯৯৪, পৃ.- ৩৬

কাজ পায়। সেখানেই সে জন্ম দেয় এক কন্যাসন্তানকে আর তার নাম রাখতে চায় 'কমলিনী'। অর্থাৎ পঙ্ক ব্যাপৃত বিকশিত পদ্মের মত নির্মল- তাই সে কমলিনী।

ভাগীরথীর কাছেই জানা যায় তার জীবনের এই কাহিনী। লেখিকা জানতে চান- এখন তার বাপের বাড়ির খবর সে জানে কিনা? সে জানায় সে তার মায়ের সাথে থাকতে চায় না। লেখিকা আরও জানতে চান- তার পতিকুলের লোকজনের খবর। কিন্তু তাদের সম্পর্কে কিছুই সে জানে না। গ্রামবাসীদের মুখে সে শুনেছে যে, তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। সে সামান্য হেসে জানায়, সেই বিষয়ে তার কোনো কৌতূহল নেয়। তাই সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টাও সে করেনি। লেখিকা তাকে বলেন তাই- **"স্বনুষ্ঠিতং ত্বয়া যদেবানুষ্ঠিতম্। ত্বয়া নারীচৈতন্যোদবোধস্য শঙ্খনাদঃ ঘোষিতঃ। নারীমহত্বং সত্যাপিতম্। আত্মনো জীবনং রসাতলাদুদধৃত্য সার্থকং কৃতবতী ত্বম্।"**[13] দীপ্তনেত্রে, গৌরবর্ণ, মনোহর মধুরস্মিত অধরোষ্ঠের মধ্যেই যেন নারীচৈতন্য প্রকাশের প্রথম কিরণ দেখলেন গল্পরচয়িতা।

'শঙ্খনাদঃ' গল্পের নামটি সুগভীর ব্যঞ্জনামন্ডিত। গল্পের কাহিনী শুধু নারীসমাজকে জাগরিতই করে না বরং সমাজে প্রতিদিন অবহেলিত, লাঞ্ছিত প্রতিটি নারীমনকে নাড়া দিয়ে যায়, আত্মচেতনা বোধে উদ্দীপ্ত করে, জীবন ও মননকে জাগরিত করে শঙ্খনাদেরই মাধ্যমে।

শঙ্খের নাদ বা শব্দ গভীর ও গম্ভীর- যা দূর থেকেও কর্ণগোচর হয় এবং মঙ্গলসূচক। তাই পরিশেষে বলতে পারি, এই শঙ্খনাদ ভাগীরথী নামে এক নারীজীবনের মঙ্গলময় সূচনারই আভাস। তার আত্মচৈতন্য জাগরণের মধ্য দিয়ে উদ্বুদ্ধ হয় পাঠকচিত্ত। সুতরাং বলা যেতেই পারে যে, এই অসামান্য গল্পটির নামকরণটি শুধু সুন্দরই নয়, যথাযথ ও সার্থক হয়েছে।

---

13 তদেব, পৃ.- ৪৫

কুলীনা (অপরাজিতা, দিল্লি, ১৯৯৪)

বীণাপাণিরচিত আমাদের নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে ‘অপরাজিতা’ গল্পগ্রন্থের সম্পূর্ণ অন্যমাত্রা ও ভিন্নস্বাদের গল্প ‘কুলীনা’। এই গল্পের কাহিনী এক নিরক্ষর নারীর অসহ জীবনের লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের চিত্রই শুধু তুলে ধরেনি, এতে ফুটে উঠেছে তার অসীম সহিষ্ণুতার অপূর্ব আলেখ্য।

এই গল্পের চরিত্রগুলি হল- সুরমা, জীবানন্দ, জীবানন্দের মা, মহেন্দ্র, মোতিমা, জ্যেষ্ঠা প্রমুখ। কূর্মাচল-এর উপত্যকায় স্থিত এক গ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে চোদ্দ বছর আগে জীবানন্দের সাথে সুরমার বিবাহ হয়। সুরমা তখন বারো বছরের আর জীবানন্দের বয়স তখন আঠেরো। এরপর কার্যার্থে দুবাই চলে যায় জীবানন্দ।

সুরমা চলে যায় বাপের বাড়ি। সেখানে সে পশু চড়ায়, ঝর্ণার জল পান করে কখন যে যৌবনে পদর্পণ করলো কেউই জানলো না। তার কৃশ কটিদেশ, সুষম দেহযষ্ঠি, পর্বতের শুদ্ধানিলের প্রভাবে রক্তাভ মুখমন্ডল তার যৌবনেরই আভাস দেয়। ছোটবেলা থেকে পিতৃসুখ থেকে বঞ্চিত, বিমাতার কাছে নানা নিপীড়ন সয়ে ওঠা সুরমা সামান্য ভোজন, বসনলাভেই তৃপ্তি পেত।

একদিন গ্রামের পত্রবাহক তার চিঠি এনে দেয় বাড়িতে। তার শ্বশুরবাড়ির চিঠি। দুবাই থেকে তাঁর স্বামী পাঁচ বছর পর এসেছে। তাই সুরমাকে যেন তার ভাইয়ের সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পতিগৃহে। সুরমার পিতৃকুলের থেকে পতিগৃহ সম্পন্ন অবস্থাপন্ন ছিল। তাই তাদের নির্দেশ মতো পরের দিন সুরমাকে শ্বশ্রুগৃহে পাঠানো হল। বিবাহের পর পাঁচ বছর স্বামীর সাথে তার দেখা হয়নি। প্রথমে সে পতিগৃহে বেশিদিন থাকেনি। দ্বিতীয় বছরে স্বামী প্রবাসে, কিন্তু তার সাথে দুবাই-এ যেতে তার মন কুন্ঠিত হতে লাগল।

এরপর আমরা দেখি, দুবাই-এ গিয়ে সুরমা দেখে তার স্বামীর বাড়িতে বছর চব্বিশের এক তরুণী। গোধূমবর্ণ দেহ তার। ভোগবিলাসিতায় পরিপুষ্ট সে। সুরমাকে দেখে তার প্রশ্ন- **“ত্বমেব সুরমাসি? তবাগমনবিষয়ে ন কিমপি সূচিতং মম পত্যা। ভবতু, আগতাসি তর্হি অত্রৈব বস।”**[14]

---

[14] অপরাজিতা- বীণাপাণি পাটনী, ১ম সং. ১৯৯৪, পৃ.- ২৫

সুরমার অজ্ঞাত আশঙ্কা বেড়ে গেল। পরে সে দেখলো ও বুঝলো যে, ওই তরুণী তার স্বামীর জীবনে অন্য নারী। তাদের সংসারে সুরমা এক কাজের লোকের মত বাস করতে থাকলো।

একদিন ওই তরুণীর (মোতিমা) জ্বর হলে সুরমাকে সে রান্না করতে বলল। কিন্তু সুরমার রান্না তার স্বামী জীবানন্দের মুখে রুচলো না। সে রান্নায় নাকি শাকে, ডালে অতিরিক্ত নুন, অন্ন মৃত্তিকামিশ্রিত ইত্যাদি। এইভাবেই কাটতে থাকলো সুরমার সপত্নীগৃহে নিত্য অপমানে অসহনীয় জীবন। লেখিকার ভাষায়- **"নৈসর্গিক এব নিয়মোঽস্তি যন্নোৎকটা বেদনা, ন বা পরমং সুখং চিরস্থায়ি ভবতি। কলাকাষ্ঠা গত্যা কালঃ, সর্বং বৃত্তজাতমতীতত্বেন বিপরিণমতি।"**[15]

একসময়ে এই নিত্য অশান্তির, অবমাননার সংসারে সুরমা ভাবে- তার মত হতভাগী আর কেউ নেই। যে কিনা স্বামী থেকেও স্বামীসুখ থেকে বঞ্চিত, ঐশ্বর্যমন্ডিত গৃহ থেকেও নিরাশ্রয়। এক কলম চিঠি লিখতেও সে অসমর্থ। চিঠিই বা সে কাকে লিখবে পিতৃকুলে বা পতিকুলে। যার স্বামীই এমন- সেখানে শ্বশুরবাড়িতে কাকেই বা কি বলবে সে। বাপের বাড়িতেও বিমাতা, বৈমাতৃক ভাই- নির্ধন তারা, কিই বা করবে তারা তার জন্যে!

সুরমার এই আত্মগ্লানির পর আমরা দেখি সে সারাদিন ধরে গৃহকার্যেই রত থাকে। এক জ্যেষ্ঠা সেবিকা তাকে খাওয়ার কথা বললেও সে ক্ষিদে নেই- এই কথা বলে খায় না। তাকে সে জল আনতে বলে আর অবশিষ্ট খাদ্য তার বাড়িতে নিয়ে যেতে বলে দেয়। বাসন ধুয়ে রান্না ঘর পরিষ্কার করতে বলে দেয় তাকে।

সুরমা মুখ বুজে তার সপত্নী মোতিমার আদেশে গৃহের সমস্ত কাজ ক'রে দিন অতিবাহিত করে। সে মনে মনে বলে- **"পরমেশ্বর! মাং শক্তিং দেহি যয়া সর্বংসহা ধরিত্রীব দুঃখং সোঢুম সমর্থা ভবেয়ম্। নীলকন্ঠ ইব সর্বং গরলং পীত্বাপি অভয়া অক্ষয়া চ ভবেয়ম্"।**[16]

---

[15] তদেব, পৃ.-২৭

[16] তদেব, পৃ.- ৩০

এরপর জীবানন্দ তার দ্বিতীয় পত্নী মোতিমাকে নিয়ে দোকানে গেলে জ্যেষ্ঠা পরিচারিকার কাছে সুরমা তার স্বামীর জীবনে এই নারীর বিষয়ে সব কথা জানতে পারে। পরিচারিকা জ্যেষ্ঠা চার বছর আগে জীবানন্দের গৃহে তার পুত্রসহ কর্মে নিযুক্ত হয়। তখন জীবানন্দ একা থাকত। জ্যেষ্ঠা রান্নাঘরের কাজ করত আর তার ছেলে ঘরদোর পরিষ্কার ও জামাকাপড় ধোয়া-কাচার কাজ করতো। একদিন জ্যেষ্ঠা তার প্রভুকে বলে বিয়ে ক'রে ঘরে বউ আনতে। কিন্তু তার উত্তরে জীবানন্দ জানায়- সে বিবাহিত এবং তার পত্নী দুবাই থেকে দূরে থাকে। তাই সে তাকে আনেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে জীবানন্দ তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে জ্যেষ্ঠাকে মাথা ঘামাতে না করে এবং পরে দেখা যায় সে আরেক নারীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর তাকেই ঘরে তুলে আনে। তাই আমরা দেখি, এই সেই নারী- যার কথায় জীবানন্দের জীবন নির্বাহ হয়। তার গ্রাম থেকে টেলিগ্রাম আসে তার মায়ের অসুস্থতার খবর দিয়ে। তাকে শীঘ্রই গ্রামে যেতে বলা আছে সেই টেলিগ্রামে। মোতিমা বলে- **"গচ্ছ, তব মাতা রুগ্নেত্যত্র নাস্তি মমাবরোধঃ। সদ্যগৃহং নিবর্ত্তয়"।**[17]

জ্যেষ্ঠার কথা থেকে বোঝা যায় মোতিমা জীবানন্দের বিবাহিতা নয়। তার বিষয়ে তার আত্মীয়রা জানে না। সুরমার আগমনে সে ভয় পেয়ে জীবানন্দকে যেতে দিতে চায় না। জ্যেষ্ঠা সুরমাকে বয়লে- **"মুগ্ধা ত্বং, ততঃ সাবধান ভব"।**[18] এই বলে সে দেওয়াল ঘড়ি দেখে তাড়াতাড়ি গৃহকর্মে উঠে যায়। সুরমা চিন্তা করে- এখন আর সাবধানের কি আছে? জীবানন্দের আত্মীয়রা বহুকাল অবধি সুরমার বিষয়ে বলতে লাগল- **"সা কুলীনা কুলবধূঃ যয়া সর্বং দুঃখজাতং নিপীয়াপি মুখেন ন কদাপি তদভিব্যক্তম্"।**[19] আর এখানেই এক লাঞ্ছিতা নারীর 'কুলীনা' আখ্যা সার্থক ক'রে তোলে তার সহিষ্ণুতার সমুজ্জ্বল মূর্তিকে।

অনুগৃহীতা (অপরাজিতা, দিল্লি, ১৯৯৪)

বীণাপাণি দেবীর 'অপরাজিতা' শীর্ষক গল্পসংকলন গ্রন্থের অন্যতম গল্প 'অনুগৃহীতা'। এ গল্পের নায়ক

---

17 অপরাজিতা- বীণাপাণি পাটনী, ১ম সং. ১৯৯৪, পৃ.- ৩৩

18 তদেব, পৃ.- ৩৪

19 তদেব।

বনমালী ও নায়িকা রাধিকা। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রগুলি হল- রাধিকার বাবা, মা বনমালীর বন্ধু রমেশ, গ্রামপ্রধান ও তাঁর পুত্র ক্ষেমেন্দ্র ইত্যাদি।

বন্ধু রমেশের অনুরোধে কূর্মাচল প্রদেশের বাগেশ্বর পর্বতের অধিত্যকাংশের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বনমালী উপস্থিত হয়। সেকাল্ডেই সে প্রথম দেখে রাধিকাকে। রাধিকা তার সখীদের সাথে সেখানে গিয়েছিল।

লেখিকার বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, বনমালী ডাক্তারি পড়ে। সে আয়তাকার, গৌরবর্ণ, মেধাবী ও রূপবান এক তরুণ। সে যখন তার বন্ধু রমেশের সাথে উৎসবে উপস্থিত হয় তখন দুপুরবেলা। নানা পণ্যবীথিতে সজ্জিত উৎসবপ্রাঙ্গণ। সেখানেই নাগরদোলায় বহু বালক-বালিকারা চড়ার জন্য উৎসুক। রাধিকা সেখানে নাগরদোলায় চড়ে আর তা থামার আগেই নামতে গিয়ে মাটিতে পড়ে যায়, ফলে অনেক ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে পড়ে গেলেও কেউ এগিয়ে আসে না। সবার নানা কথা শোনা যায়- কোথায় ক্ষত, ঔষধ দাও, চিকিৎসক আনো ইত্যাদি। কিন্তু বনমালী সবার মধ্যে থেকে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে নিজ চিকিৎসাজ্ঞান প্রয়োগ করা কর্তব্য বলে মনে করলো। সে রাধিকার ক্ষতস্থান জলে ধুয়ে ওষধি লাগিয়ে কাপড়ের টুকরো বেঁধে দিলে তারপর রাধিকার জ্ঞান ফিরলো। সে যখন চোখ মেলল তখন সে বনমালীকেই সামনে দেখতে পেল। সে উঠে বসেই বলল- **"কথমহং ভূমৌ পতিতা ক্ষত চ নাহং জানে। পরন্তু ভবতঃ অনুগ্রহন্তু ন বিস্মরিষ্যামি"।**[20]

বনমালী রাধিকার আয়তাকার লোচন, বিম্বাধর-ওষ্ঠ, চন্দ্রের মত কান্তিময় মুখমন্ডল, স্বর্ণপুষ্পশোভিত মনোহর নাসিকা, সুদীর্ঘ বেণি দেখে মুগ্ধ। **"বনমালিনা বাল্যাকালাদেবোভয়লিঙ্গি বিদ্যালয়েষু পঠিতমাসীৎ। চিকিৎসাসংস্থায়াঞ্চ তেন সহানেকাঃ ছাত্রাঃ চিকিৎসাশাস্ত্রং পঠন্তি স্ম। পরন্তু সর্বপ্রথমমেব তেনেদৃশং ভব্যং নারীসৌন্দর্যমনুভূতম্"।**[21]

(Continued on page 131)

---

20 অপরাজিতা- বীণাপাণি পাটনী, ১ম সং. ১৯৯৪, পৃ.- ৪৭

21 তদেব।

Ma with G B Palsule, renowned oriental scholar

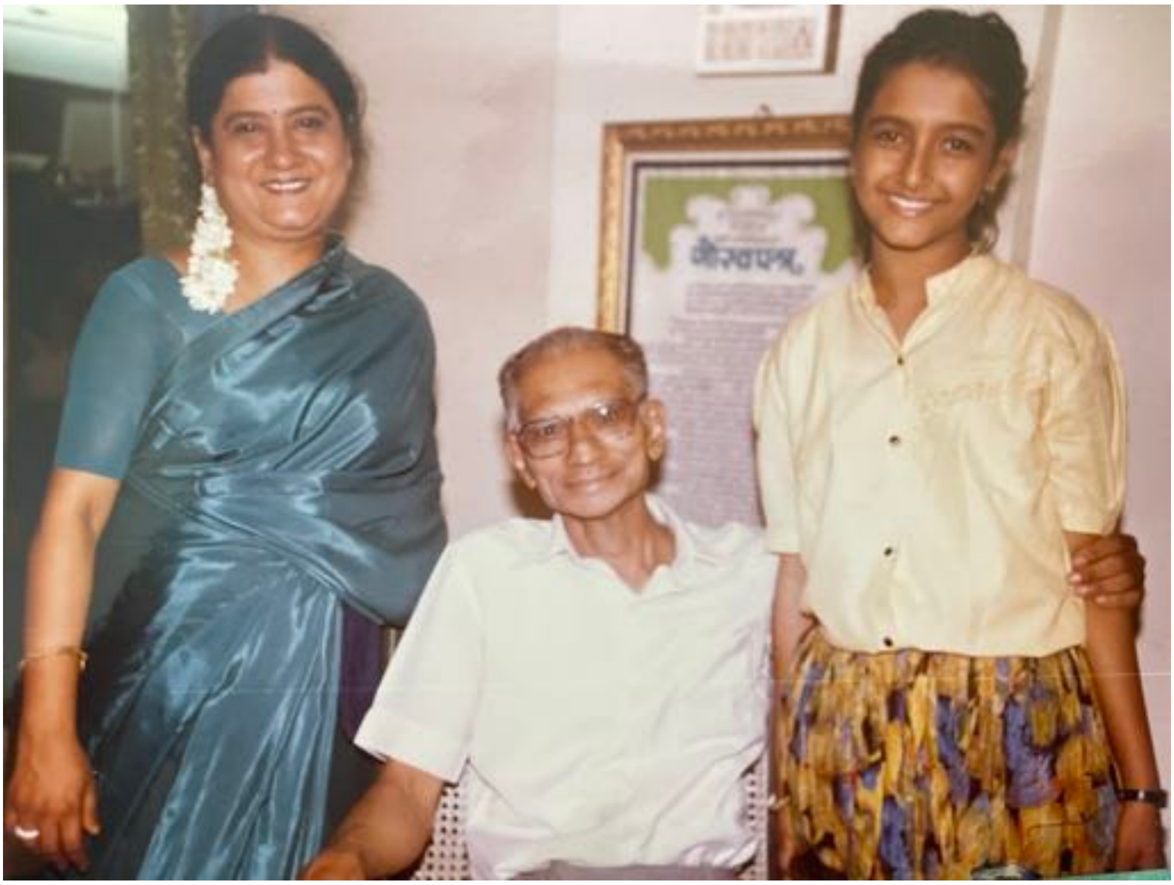

Ma with Clinton B Seely

(Professor Seely is Emeritus Professor, The University of Chicago, Department of South Asian Languages and Civilizations)

With Clinton B Seely

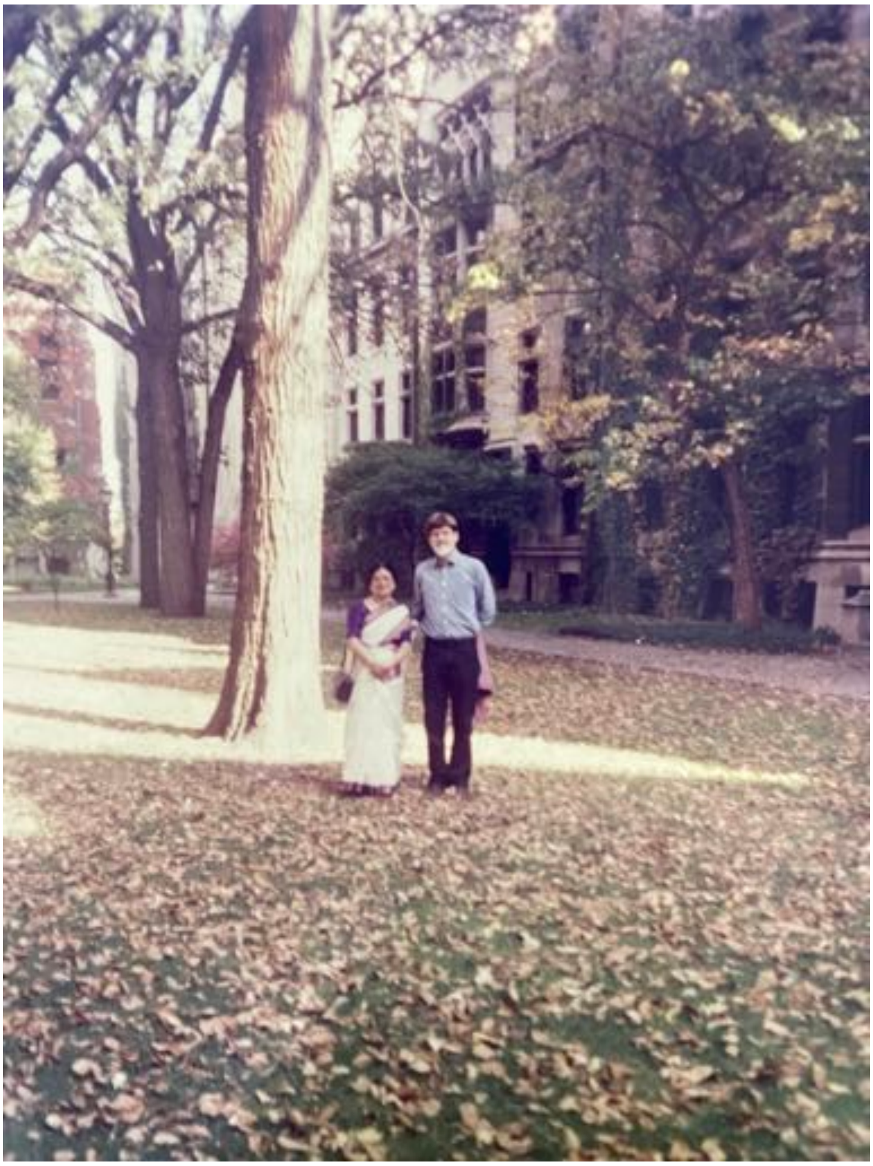

Ma in Madison

Ma with Richard Francis Gombrich (left) in Oxford
(Professor Gombrich is a British Indologist and scholar of Sanskrit, Pāli, and Buddhist studies. He was the Boden Professor of Sanskrit at the University of Oxford from 1976 to 2004)

Ma with delegates in Vienna 1991

Ma an accomplished Rabindra sangeet singer

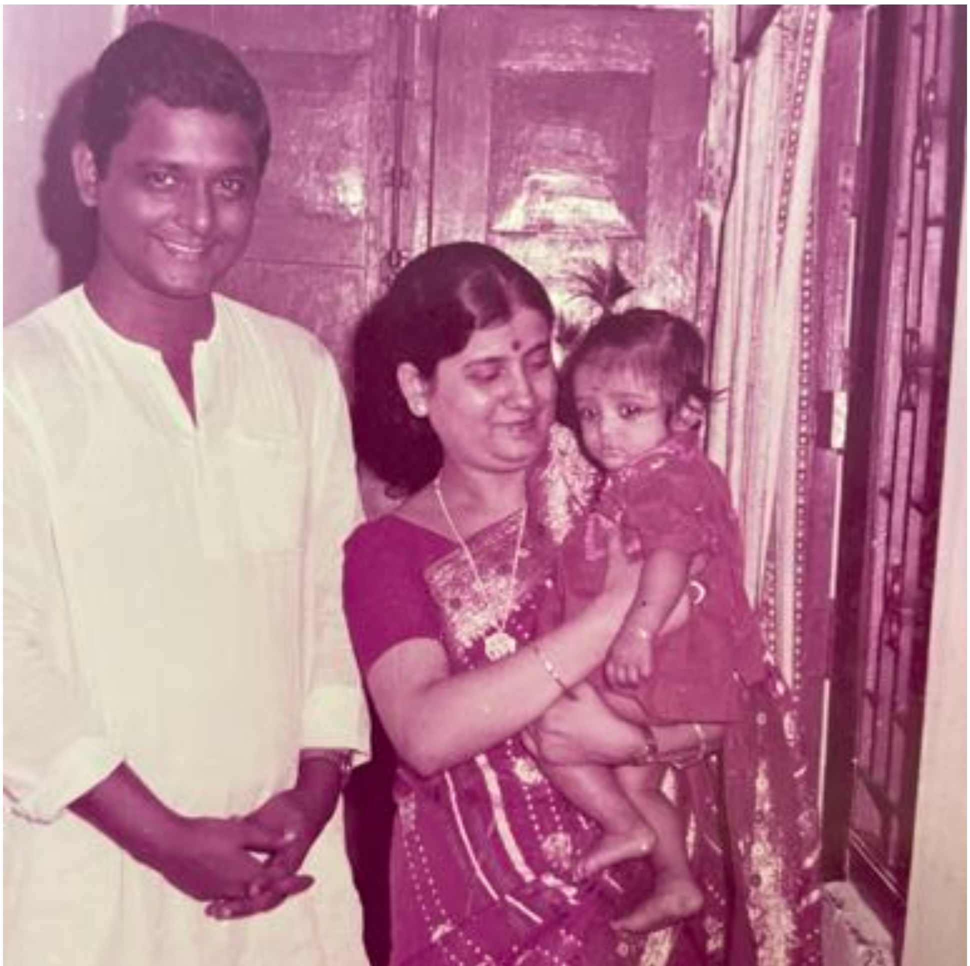

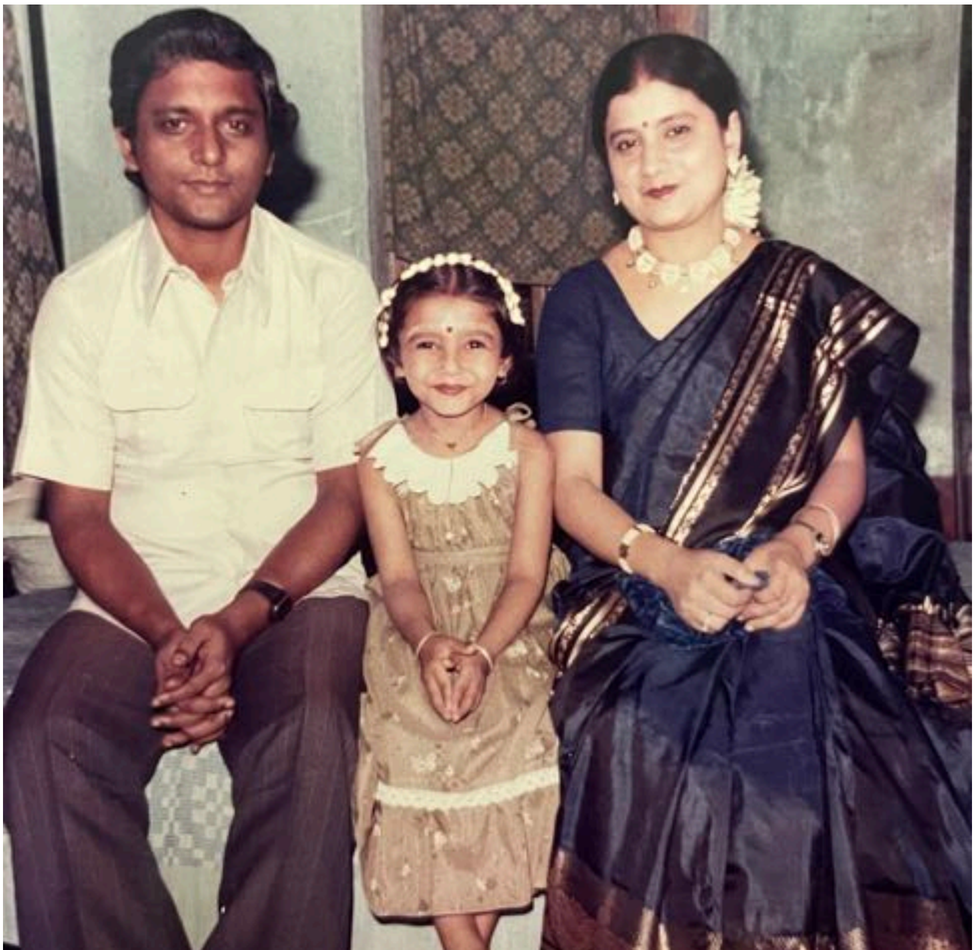

(Continued after page 116)

এরপর বনমালী তার বন্ধু রমেশের পরিচিত একজনের জীপগাড়ির ব্যবস্থা করে রাধিকাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। কারণ তার পক্ষে হেঁটে বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়। বনমালী রাধিকার বাড়ি গিয়ে জানতে পারলো যে, রাধিকা তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার সাথে থাকে। বাড়ি ফেরার পর রাধিকা বনমালী ও তার বন্ধুর জন্য চা ক'রে আনলে তারপর বনমালী তার থেকেই জানতে পারলো যে, সে গ্রামীণ সরকারী বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণী অবধি পড়েছে। বনমালী রাধিকার কাছে তার নাম জানতে চাইলে রাধিকা লজ্জানত মুখে তার নাম জানালো। বনমালী বলল মধুর নাম! এরপর পরেরদিনও তাদের বাড়ি আসবে বলে জানিয়ে গেল বনমালী।

এরপর আমরা দেখি, রাধিকার বাড়িতে বনমালী যাতায়াত করতে থাকে। রাধিকার দুই ভাইয়ের একজন দূরে কোন নগরে কাজ করে; অন্যজন গুজরাতে থাকে সপরিবারে। সেনার সুবেদার পদাধীন সে। তারাই যে স্বল্প অর্থ পাঠায় তাতেই তাদের সংসার চলে।

এদিকে রাধিকা-বনমালীর পরস্পরের পরিচিতি গ্রাম্যজনদের সংকীর্ণ মানসিকতা প্রকাশ করে। গ্রামপ্রধান রাধিকার বিবাহের প্রস্তাব আনে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সাথে। যে কিনা বিপত্নীক, দুই কন্যার পিতা। রাধিকার পিতা জানকীবল্লভ নিরক্ষ, কেবল কৃষিকর্মজীবি পাত্রের সাথে তাঁর আঠারো বছরের মেয়ের বিয়ে দিতে চান না। রাধিকার মাও এই বিয়েতে রাজি নন।

এরপর জানকীবল্লভ জ্বরে পড়েন, চিকিৎসকের খোঁজে যায় রাধিকা। বনমালী সে সময় গ্রামে ছিল না। পরের দিন সকালে মারা যান জানকীবল্লভ।

গ্রামপ্রধান রাধিকার মায়ের কাছে তার পুত্রের সাথে রাধিকার বিবাহ বিষয়ে বিবেচনা করতে বলেন। কিন্তু রাধিকার মা সেই বিষয়ে সেসময় কথা বলতে চান না। রাধিকাদের অশৌচকাল নিবৃত্ত হলে তার ভাইয়েরা নিজ নিজ নগরে চলে যায়।

একদিন মন্দিরের নিকটবর্তী ঝর্ণাতলায় বনমালীর জন্য অপেক্ষামানা রাধিকাকে প্রধানের পুত্র একা পেয়ে জোর ক'রে মদোন্মত্ত অবস্থায় তার হাত ধরে তাকে অসম্মান করার চেষ্টা করে। সেই সময়ই বনমালী সেখানে উপস্থিত হয়। বনমালী তার পরিচয় জানতে চাইলে প্রধানের পুত্র বলে যে, রাধিকার ভ্রাতা তার সাথে রাধিকার বিবাহের অনুমতি দিয়েছে জ্যৈষ্ঠমাসে। বনমালী সে পত্র রাধিকাকে দেখায়। রাধিকা জানায় সে চিঠি তার ভাইয়ের লেখা নয়। বনমালী ও ক্ষেমেন্দ্রের মুষ্ঠিযুদ্ধ বাধে। এরপরে ক্ষেমেন্দ্র গ্রামের পঞ্চায়েতের সামনে রাধিকা-বনমালীকে নিয়ে কুৎসা ছড়ানোর চেষ্টা করে। পঞ্চায়েতের বিচারসভায় বনমালী বলে রাধিকা অষ্টাদশ বছরের। অর্থাৎ সে কাকে বিবাহ করবে তা তারই নির্ণয় হওয়া উচিত। এইভাবে পঞ্চায়েতপ্রধান রাধিকা ও বনমালীকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ফেলার চেষ্টা করে যায়।

রাধিকা তার মাকে জানায় যে, ওই কুপথগামী নরপশু প্রধানপুত্রকে বিয়ে করার চেয়ে তার কাছে মৃত্যু শ্রেয়। এইটাই তার শেষ সিদ্ধান্ত। তার নেত্র অশ্রুপ্লাবিত হয়। তার মা তাকে সান্ত্বনা দেয়। বনমালী রাধিকার দুটি হাত নিজ হাতে নিয়ে বলে সে একা নয়, সেও তার পথের সহগামী- এটা যেন সে কখনো না ভোলে। রাধিকা জানতে চায় বনমালী কি তাকে বিবাহ করবে! তার উত্তরে সে জানায়, রাধিকার কি তাতে কোনো সন্দেহ আছে! এরপর রাধিকার স্মিতমুখে উত্তর- **"অনুগৃহীতাস্মি"**।

আর এখানেই এই গল্পের নামের সার্থকতা। সুশোভনরূপে বর্ণিত গল্পের কাহিনী প্রথম থেকেই পাঠককে এক উৎকন্ঠায় রাখে এবং শেষে রাধিকা-বনমালীর সম্পর্কের এই সুপরিণতীর ইঙ্গিত আশায় আমাদের বুক বাঁধে। তাই তো বলা যায়-

'ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যাথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হয়ে হইল না শেষ’।[22]

আর এখানেই বীণাপাণি দেবীর লেখা গল্প ছোটগল্পরূপে সার্থক হয়ে উঠেছে।

বাতায়নম্ (অপরাজিতা, দিল্লি ১৯৯৪)

প্রথমেই বলি এই গল্পটির নামকরণই আমাদের জানিয়ে দেয় এটা শুধুমাত্র এক নারীর জীবনে প্রবঞ্চিত হওয়ার কথা নয়- এতে আছে প্রবঞ্চনার শিকার হয়েও কিভাবে নিজের জীবনে সেই সমস্যার থেকে সাহস ও আত্মসম্মানের সাথে বেরিয়ে আসা যায়। আর জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার যে দিক- সেই বাতায়নই খুলে দিয়েছে আমাদের সামনে।

এ গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম সরলা। পুরো গল্পটির ঘটনা সে বলে তার এক বান্ধবী অমলাকে। গল্পের প্রধান চরিত্র সরলা এক কার্যালয়ে কার্যরত। ঘটনাচক্রে তার আলাপ হয় সঞ্জয়ের সাথে। সে তার সহকর্মী। তারা অঙ্গরী বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ করে একসময়। বিবাহের পর সঞ্জয় বাড়ি যায় গ্রামে ও সরলাকে কথা দিয়ে যায় সে তাকে ফিরে এসে সামাজিকভাবে বিয়ে করবে। যা সে করেনি কখনো আর। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় মহাকবি কালিদাসের “শকুন্তলা” নাটকের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার কথা।

দেখতে দেখতে দু’মাসের মধ্যেই সরলার জীবন বদলে যায়। সে অন্তঃসত্ত্বা। তার বাবা-মা তাকে উপদেশ দেন গর্ভপাত করানোর জন্য। কিন্তু সরলার বক্তব্য- **“নাহং ভ্রূণহত্যাপাতকং সমাচরিষ্যে”।**[23] সে আশ্রয় নেয় তার এক বান্ধবী শোভনার বাড়িতে। তাদের অতিথিগৃহে (guest room) সরলাকে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে বলে শোভনা। কিন্তু সেও তাকে বলে যে, লোক-সমাজ-আত্মীয়-স্বজন সবার থেকে দূরে কিভাবে সে বাঁচবে! কিন্তু সরলা তার সিদ্ধান্তে অনড়, সে দৃঢ়নিশ্চয়। শোভনা তাকে সোজা পথের কথা ভাবতে বলে। সরলার উক্তি- **“শোভনে! যস্যা নিয়তৌ কঠিনঃ পন্থা লিখিতঃ তস্যাঃ ঋজুমার্গবিষয়ে চিন্তনমপি নোচিতম্”।**[24]

এরপর সরলা চাকরিতে নিবেদন জানায় বদলির জন্য ও অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করতে চায়। এরই মধ্যে একদিন দোকানে কিছু জিনিস কিনতে গিয়ে সঞ্জয়েরই এক বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে যায় সরলার। সেই বন্ধু সঞ্জয়ের বাড়িতে তাকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সে সেখানে যেতে রাজি হয় না। পড়ে বান্ধবী শোভনার

---

22 গল্পগুচ্ছ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সর্বশেষ সং. বৈশাখ, ১৪০৫, পৃ.- ৮৪৫

23 অপরাজিতা- বীণাপাণি পাটনী, ১ম সং. ১৯৯৪, পৃ.- ৮১

24 তদেব, পৃ.- ৮২

সাথেই সে সেখানে যায় ও জানতে পারে তার তথাকথিত স্বামীর কীর্তির কথা। সঞ্জয়ের মা জানান- সঞ্জয় বিয়ে করে অন্য গ্রামে গেছে। সরলার মাথায় যেন বজ্রপাত হয়। এমন সময় সঞ্জয় সরলার সম্মুখীন হয় এবং তার মা ও পত্নীর সামনে যথারীতি সে অস্বীকার করে অন্তঃসত্ত্বা সরলাকে। সরলা তাকে 'এস' নামাঙ্কিত তার পরিয়ে দেওয়া অঙ্গুরীয় দেখালেও সে পুরোপুরিভাবে তাকে না চেনার ভান করে। বরং একথা বলে- **"নগরে ঈদৃশ্যা কপটনার্যো বহু দৃশ্যন্তে, যাঃ পুরুষান্ প্রতার্য আত্মনঃ স্বার্থপূর্তিং সমাচরন্তি"।** এ যেন আবার আমাদের সেই "শকুন্তলার"র পঞ্চম অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের উক্তি মনে করিয়ে দেয়- **"স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম্..."** ইত্যাদি।[25]

এরপর সঞ্চয়ের দ্বিতীয়া স্ত্রী পুলিশের কাছে যাওয়ার কথা তোলে। সরলা তার বান্ধবী শোভনার সাথে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। শোভনা সরলাকে তার বাসস্থানে ছেড়ে দিয়ে নিজের বাড়ি যায়। সরলা ভাবে তার সরল স্বভাবই তার ঘাতক হয়েছে অথবা এ তার পূর্বজন্মের কোনো কাজের ফল!

তারপর সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় আর তার নাম রাখে অজয়। কারণ তার গর্ভকালীন অবস্থায় জীবনে-মননে যে দৃঢ় আস্থার সঞ্চার হয়, সেই সহিষ্ণুতা থেকেই সন্তানের এই নামকরণের সিদ্ধান্ত। এরপর আমরা দেখি, জন্মপরিচয়পত্রে শিশুর পিতার নাম আবশ্যক। এটা জগতের নিয়ম কিন্তু পিতার নামরহিত নাগরিক কি মৃত! তারপর বান্ধবী অমলা সরলাকে বলে যে, সে একা নয়, তার সহায়ক তার পুত্র অজয় আছে। শোভনা সেও তার পাশে আছে। সরলা মৃদু হাসে।

সন্ধ্যা সমাসীন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নগরের পথে বিদ্যুৎ আলোক জ্বলে ওঠে। সে বাতায়ন (জানলা) খুলে দেয়। তারপর নিজের সান্ধ্যকর্মে ব্যস্ত হয়।

অর্থাৎ সরলা শুধু এক সৎসাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী নারী নয়, সে তার জীবনের সংকটাপন্ন সময়েও অবিচলিত থেকে বেঁচেছে নিজে ও নতুন প্রাণ এনেছে পৃথিবীতে। তার যথার্থরূপেই বাতায়ন খুলে দিয়েছে সে এই সমাজের সামনে। যে বাতায়ন দিয়ে সন্ধ্যে নামার পর সূর্য ওঠার আশা আমরা দেখতে পাই।

---

[25] "স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমানুষীষু

সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।

প্রাগন্তরিক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাত-

মন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি"। ৫/২২।।

মহাকবি কালিদাসপ্রণীতম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, সম্পা. শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, ষষ্ঠ সং. ২০০৫, পৃ.- ৩৫৭

বীণাপাণি দেবীর লেখা থেকে জানা যায়- কন্যা রুচিরার কাছে ফ্রান্সে গিয়েই অবসর সময়ে তাঁর এই "অপরাজিতা" গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি লেখা। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তাঁর লেখা এই সংকলনের গল্পগুলি গ্রন্থের নামের মতই অপরাজেয়।

তাঁর রচনাগুলো পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম লেখিকা গৌরী ধর্মপালের কথা। বীণাপাণি ও গৌরী উভয়েই মহিলা নাট্যকার বলেই হয়তো নারীমনের- অন্তরের যন্ত্রণার আলেখ্য সুস্পষ্ট হয়েছে তাঁদের সৃজনীতে।

বীণাপাণির নাটক ও ছোটগল্পে মূর্ত নারী নির্যাতন, নারীর আত্মচেতনা উন্মোচনের কাহিনী। মেয়েদের বাঁচার লড়াই- অস্তিত্বের সংকট, সমস্যাই ধরা পড়েছে তাঁর 'অপরাজিতা' শীর্ষক গ্রন্থে। তাঁর লেখা নির্বাচিত গল্পগুলি হল- 'অপরাজিতা', 'শঙ্খনাদঃ', 'বাতায়নম্', 'কুলীনা' ও 'অনুগৃহীতা'। এই পাঁচটি গল্পেই পাঁচ প্রকারভাবে সমাজে ও সংসারে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'অপরাজিতা'য় বিজয়া, 'শঙ্খনাদ'-এ ভাগীরথী, 'বাতায়নম্'-এর সরলা, 'অনুগৃহীতা'-র রাধিকা, 'কুলীনা'-র সুরমা- এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহিমায় উদ্দীপিত করেছে আমাদের। সমাজে ও সংসারে নারীজীবনের নানা সমস্যা ও সেই সমস্যা সমাধানের পথও দেখিয়েছে বীণাপাণি সৃষ্ট এই চরিত্রগুলি।

তাঁর গল্পের নামকরণগুলিও হয়েছে সুন্দর ও সার্থক। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের "সাহিত্যদর্পণ"-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নামকরণ প্রসঙ্গে পাই- "নাম কার্য্যং নাটকস্যগর্ভিতার্থ প্রকাশকম্" (৬. ১৪২)। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ছোটগল্পগুলিতে নামকরণের ক্ষেত্রেও যেন এই লক্ষণেরই আভাস পাই। বীণাপাণি দেবীর লেখা আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির প্রতিটি তার মর্মার্থ নামকরণের মাধ্যমে অপূর্ব ব্যঞ্জনার দ্বারা তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। তাঁর গল্পগুলোর প্রাকৃতিক বর্ণনাতেও আমরা দেখি তিনি নিপুণ হস্ত। শুধুমাত্র অনবদ্য চরিত্রসৃজন নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও চতিত্রের মাধুর্য সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। যা আমাদের শুধু বিস্মিত করেই তোলে না- করে অনুপ্রাণিতও। 'অপরাজিতা'-য় ফুটে উঠেছে নায়িকা বিজয়ার সংসারে নিষ্পেষিত অবস্থার থেকে আত্মমর্যাদা রক্ষা ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার চিত্র। 'শঙ্খনাদ' ও 'বাতায়নম্'-এ পাই নারীমনের দৃঢ়তা ও অতীত জীবনকে আঁকড়ে না ধরে নতুনভাবে এগিয়ে চলার কথা। 'কুলীনা' পুরুষের প্রবঞ্চনায় দৃঢ়নিশ্চয়ে কুলমর্যাদা রক্ষার কথা জানায় আর 'অনুগৃহীতা'-য় রাধিকা-বনমালীর সুমধুর সম্পর্ক-সৃজনের আলেখ্য ধরা পড়ে।

প্রতিটি গল্পের সমাপ্তিই অসামান্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যথাযথ। যা গল্পে বর্ণিত সমস্যার কথা তুলে ধরেছে শুধু এমন নয়, তার সমাধানের পথও দেখিয়ে দিয়েছে পাঠককে । তাই এককথায় বলতে পারি, বীণাপাণি পাটনি রচিত ছোটগল্প বা লঘুকথাগুলি শুধুমাত্র আধুনিক সংস্কৃত কথাসাহিত্যকে নয়, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছে।

আলংকারিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলতে গেলে, দশম শতাব্দীর স্বনামধন্য আলংকারিক রাজশেখর তাঁর "কাব্যমীমাংসা" গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিভার দু'ধরনের ভেদ দেখিয়েছেন। একটি কারয়িত্রী এবং দ্বিতীয়টি ভাবয়িত্রী। প্রথমটি কাব্য সৃষ্টির ধারা এবং অন্যটি কাব্য সমালোচনার ধারা।

তাই যদি গল্পসাহিত্যে ছোটগল্প বা লঘুকথাকে কাব্য বা গদ্যকাব্য অথবা শ্রব্যকাব্যের একটি ভেদরূপে ধরি তাহলে আমাদের এই গল্পকাররা কবি। আর তাই আমাদের সম্মানীয়া বীণাপাণি দেবী কারয়িত্রী প্রতিভাশালী।

পরিশেষে বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম ফসল এই লঘুকথা বা ছোটগল্প। যার মর্মেই আছে- "শেষ হয়েও হইল না শেষ'।

আমাদের আলোচ্য বীণাপাণি দেবীর কথাপঞ্চক ('অপরাজিতা', 'শঙ্খনাদঃ', 'বাতায়নম্', 'কুলীনা' ও 'অনুগৃহীতা') এককথায় অনবদ্য ও কালজয়ী রচনা বলা যায়। যেগুলো সমস্যাকীর্ণ নারী-জীবনচিত্র তুলে ধরেছে ও সুন্দর পরিসমাপ্তির মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছে জীবনের চলার পথে বিচরণের পথখানিও। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের রচনা আমাদের শুধু পৌরবান্বিতই করেনি; করেছে সুসমৃদ্ধও।

তাই পরিশেষে বলতে পারি, মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য কথাবিস্তারে আর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য কথাসংহতিতে স্বল্পভাষী ব্যঞ্জনায়। এর ফলে মহাকাব্য আস্বাদনে কথার পিপাসুর পরিতৃপ্তি আর ছোটগল্প বা লঘুকথা আস্বাদনে থাকে অন্তহীন জিজ্ঞাসা ও অতৃপ্ত পিপাসা। আর এই অন্তহীন জিজ্ঞাসা ও অতৃপ্ত পিপাসার ভাব-সাগরে সার্থকভাবেই নিমজ্জিত হওয়া যায় বীণাপাণি দেবীর লঘুকথায়। সেদিক দিয়েই প্রতিটি গল্পই তাঁর সার্থক ও সুন্দর!

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র-পত্রিকা

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ (প্রাথমিক উৎস)

• অপরাজিতা--ড.বীণাপাণি পাটনীপ্রণীত,নাগপ্রকাশক,দিল্লি,১৯৯৪

সহায়ক সংস্কৃত গ্রন্থ

• অগ্নিপুরাণ-- পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলকাতা,১৯৯৭,৩৩৭ অধ্যায়

- অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্(মহাকবি কালিদাসপ্রণীতম্)--শ্রী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,কলকাতা,১ম সং.১৯৮৮,ষষ্ঠ সং.২০০৫
- কাব্যাদর্শ,চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত,কলিকাতা,১৯৯৫,১।১১
- কাব্যানুশাসন(হেমচন্দ্র)--শিবদত্ত ও পরব সম্পাদিত,৮ম অধ্যায়
- সাহিত্যদর্পণঃ-- ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,২য় সং.২০১৩,কলকাতা

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

- চক্রবর্তী,ইন্দ্রাণী--বাংলা ছোটগল্প রীতিপ্রকরণ ও নিবিড় পাঠ,রত্নাবলী, কলকাতা,১৯৯৪
- চট্টোপাধ্যায়,ঋতা--আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ১৯১০-২০১০ ছোটগল্প ও নাটক,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কোলকাতা,২০১২
- চট্টোপাধ্যায়,হীরেন--সাহিত্য প্রকরণ,বামাপুস্তকালয়,কলকাতা,১৪০২
- ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ--ক) গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,কলকাতা,১৪০৫

খ)গীতবিতান,পূজা।স্বদেশ,বিশ্বভারতী,কলিকাতা,১৯৬৩

গ) রবীন্দ্ররচনাবলী(পঞ্চদশখণ্ড),বিশ্বভারতী,কলিকাতা,চৈত্র ১৩৯৮,পুঃমুঃ ১৪০২

দাস,করুণাসিন্ধু--সংস্কৃতসাহিত্যপরিক্রমা,রত্নাবলী,কলকাতা,১ম প্রকাশ এপ্রিল,১৯৯০

বন্দ্যোপাধ্যায়,ধীরেন্দ্রনাথ--সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,কলকাতা,১ম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮/এ

ইংরেজী গ্রন্থ

Raghunathacharya,S.B.(.ed.)-- Modern Sanskrit Literature: Tradition & Innovation,Sahitya Academi,New Delhi,1st ed.2002,reprint 2009

পত্রিকা

নন্দন পত্রিকা।সংস্কৃত গল্পসাহিত্য সেকাল ও একাল।করুণাসিন্ধু দাস।

(অর্পিতা সিংহ চৌধুরী , প্রাক্তন ছাত্রী, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, চলভাষঃ ৯৪৭৪৮২২৫২৫, মেইলঃ asinhachoudhury002@gmail.com)

সরস্বতী নদীর দেবীত্বে রূপান্তর

স্বাতী পারেখ

দেবী সরস্বতী আমাদের অতি আদরণীয়, শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয়। সর্বকালে সমাজে জ্ঞান-বিদ্যা এক উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। কথাই আছে "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে"। বিদ্বান ব্যক্তির কদর সর্বত্র। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। তাঁর আরাধনায় জ্ঞান, বুদ্ধি, শিল্পচর্চার উন্নতি হয় -- এটি একটি বহুযুগের লালিত ধারণা।

প্রাচীনকালে দেবী সরস্বতীর নামে এক বিখ্যাত নদী ছিল। বেদ, পুরাণ প্রাচীন কাহিনিতে সরস্বতী নদীর বন্দনা ও প্রশস্তি পাওয়া যায়। সরস্বতী নদীর তীরে প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব। এই নদীর মহিমা অতীব গৌরবোজ্জ্বল। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখতে পাই , যে কোন মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে স্বচ্ছ-সলিলা প্রবাহিনী নদীর তীরে। জল ছাড়া জীবন হয় না। যেখানে প্রবাহিত জলধারা, সেখানেই গড়ে উঠেছে সভ্যতা: যেমন নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, সরস্বতী নদীর তীরে আর্য সভ্যতা।

হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যদি বেদ-পুরাণ,উপনিষদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়, তবে দেখা যাবে যে সর্বত্র সরস্বতী নদীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। মহাকাব্যগুলোতে ও বহু হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে এই নদীর গরিমা উপস্থিত।

ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। সিন্ধু সভ্যতা বৈদিক যুগেরও পূর্বের। বলা হয় সরস্বতী নদীর তীরবর্তী সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতারও আগেকার, আনুমানিক আট হাজার বছর আগে। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে একদা বিপুল জলরাশি বাহিত সরস্বতী নদীর শুষ্কতার কথা। সরস্বতী নদীর উৎসস্থল এবং তার প্রবাহের পথ লুপ্ত হয়ে যাওয়া নিয়ে প্রচুর গবেষণা, তর্ক-বিতর্ক আছে, এখনও তার সিদ্ধান্ত হয় নি। কেউ বা বলে সরস্বতী নদী একটি কল্পকথা (মিথ)।

১৯২১ ও ১৯২২ সালে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর খনন কার্যের ফলে জানা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার বয়স ২৫০০-৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এটি প্রাক-বৈদিক নাগরিক সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার অধিকাংশ স্থান সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বলে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা এই সভ্যতাকে সরস্বতী সভ্যতা বলে মনে করে।! অনেকে আবার একে সিন্ধু সরস্বতী সভ্যতাও বলে। সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বহু প্রাচীন কাল থেকেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু সরস্বতী নদী ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। এই পরিবর্তনের পশ্চাতে ভৌগলিক ও পরিবেশ গত কারণ ছিল। বৈদিক যুগে সমস্ত নদীর মধ্যে সরস্বতী নদী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। সরস্বতী বিধৌত অঞ্চল সুজলা,সুফলা ছিল। এই নদীর তীরেই সত্যদ্রষ্টা মুনিঋষিরা বৈদিক সাহিত্য রচনা করে গেছেন।

দেশভাগের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পর যা কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে সিন্ধু নদের পরিবর্তে প্রস্তাবিত সরস্বতী নদীর খাত বরাবর অধিকাংশ হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। আমেরিকার Landsat নামে উপগ্রহের মাধ্যমে যে ছবি পাওয়া গেল,তাতে সরস্বতী ও শতদ্রুর প্রাচীন খাতগুলোর আভাস পাওয়া গেল।প্লেটটেকটোনিক সূত্র ধরে বোঝা গেল বর্তমানের ভারতের ঘগ্‌গর নদীর শুকনো খাত হল প্রাচীন সরস্বতী নদীর খাত।এটি পরে পাকিস্তানে হাকরা নামে পরিচিত হয়েছে। এই অভিমতটি যশপালের। তিনি আরও বলেন যে শতদ্রু এবং যমুনা নদী একদা এই ঘগ্‌গর নদীর খাতে এসে পড়ত।ভাবা এটোমিক রিসার্চ সেন্টার (BARC) এর গবেষকেরা বলেছেন এই নদী ৮৫০০বছর আগে হিমবাহ গলা জল আনত। শতদ্রু ও যমুনা র জল এসে মিশে নদীকে স্রোতোস্বিনী করে তুলেছিল কিন্তু যমুনা ও শতদ্রু প্লেটটেকটোনিক কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সরস্বতীর হিমবাহ গলা জল গেল কমে,ফলে নিজের জল আর বৃষ্টির জলকে সম্বল করে গতিশীল হওয়া সম্ভব হল না। কুরুক্ষেত্রের কাছে যমুনানগরের আদি বদ্রী স্থানে এই নদীর শুষ্ক রূপ দেখা দিল। মহাকাশ থেকে নেওয়া ছবি থেকে বোঝা যায় যে মোহনার কাছে সরস্বতী ৫ মাইল বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী কালে সরস্বতী পশ্চিমমুখী হয়ে রাজস্থানের অনুপগড়ের কাছে দক্ষিণ দিকে গতি পরিবর্তন করে কচ্ছের রাণের পশ্চিম দিকে আরব সাগরে পড়ে। বর্তমানে এখানে নারা নামে একটি নদী আছে।একে সরস্বতী নদীর প্রাচীন খাত বলা হয়। সিন্ধু সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে সরস্বতী আরো পশ্চিমে সরে যায় এবং

পাকিস্তানের মারোট অঞ্চলে সিন্ধু নদে পড়ে,। ধীরে ধীরে মরু অঞ্চলে লুপ্ত হয়ে যায়, নিজ গরিমা হারায়। কালিবঙ্গান,কুণাল ইত্যাদি স্থানে যে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তা এই সরস্বতী নদীর মজা খাতের অঞ্চল। গবেষণায় দেখা যায় ৮০০০ বছর আগেই সরস্বতীর গতিপথ রুদ্ধ হয়েছে, সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে সরস্বতী নদীর তীর ধরে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের প্রভাস তীর্থ পর্যন্ত তীর্থ ভ্রমণের কথা। অতএব বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বিবিধ গবেষণা র সাহায্য নিয়ে আমরা অবশ্যই বলতে পারি সরস্বতী নদী কল্পকথা বা মিথ নয়।

সরস্বতী নদীর তীরেই বেদ রচিত হয়েছিল। ঋক্, সাম ,যজু ও অথর্ব এই চারিটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। ঋগ্বেদেই সরস্বতী নদী সম্পর্কিত অধিক তথ্য পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে দশটি মন্ডল ও ১০২৮টি সূক্ত। সরস্বতী সম্পর্কিত ৭৫টি মন্ত্র আছে। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ আদি সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা মন্ত্রগুলির রচয়িতা। মন্ত্রগুলিত সরস্বতী প্রাকৃতিক বর্ণনা,মাতৃরূপের বর্ণনা,বিদ্যা ও বাণীর দেবী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। নদীরূপা সরস্বতী ভারতবাসীর সামাজিক,ধর্ম ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠল।

মানুষ প্রকৃতির শক্তি র কাছে অসহায়। শক্তির প্রকাশে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ শক্তি র আরাধনা করে শক্তি র ভয়াল রূপকে তুষ্ট করতে চেয়েছে। যে প্রকৃতির কাছ থেকে বেঁচে থাকার রসদ পেয়েছে তাঁকে পূজা করে কৃতজ্ঞ হতে চেয়েছে। সূর্যের পরাক্রম ও শক্তি,বায়ুর শক্তি,অগ্নির শক্তি, মেঘের শক্তি তে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে তাদের স্তুতি করেছে,মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। শক্তি সমগ্র দেব-দেবী রূপে আরাধিত হতে হতে ক্রমে আকার ধারণ করে মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হয়েছেন এবং হয়ে চলেছেন।

বেদে দেখা যায় দেবতারা মানুষের আকৃতিতে পূজিত। শুধু তাই নয়,যে দেবতার যেমন কর্ম,তেমনি তার বর্ণ। মৃত্যুর দেবতা যম, ভয়ংকর সে,তাই তার রঙ কালো। সরস্বতী নদীর বর্ণনায় তার রঙ শুভ্র। । ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে যে পরিচয় পাই,তাতে দেখা যায় যে বিপুল জলরাশিবাহিনী সরস্বতী নদী থেকে মানুষের উপকার হচ্ছে, তিনি অন্ন দিচ্ছেন, প্রতিপালন করছেন,অতএব তিনি পূজনীয়,'তাঁর স্তুতি কর।”

"অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি। "ঋগ্বেদ দ্বিতীয় মন্ডল ৪১ সূক্ত ১৬সংখ্যক ঋক্।
মাতাদের মধ্যে শ্রেষ,নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে সরস্বতী আমাদের সমৃদ্ধশালী করো।"
" বৃহদু গায়িসরস্বতীমিন্মহয়াষে বচোহসূর্যা নদীনাম।
সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈর্বশিষ্ঠ রোদসী।"
বশিষ্ঠ , তুমি নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরস্বতী র স্তোত্রগান করো, স্তোম দ্বারা স্তুতি করো।

এইভাবে নদী সরস্বতী দেবী সরস্বতী তে রূপান্তরিত হলেন।

আবার বিপরীত তথ্য ও পাওয়া যায়। দেবী সরস্বতী দেবতাদের সমস্যা র সমাধান করতে দেবী সরস্বতী থেকে নদী সরস্বতীতে রূপান্তরিত হন। সাধারণভাবে বলা হয়,সরস্বতী ব্রহ্মার মানস কন্যা। কোন স্থানে তিনি ব্রহ্মার স্ত্রী রূপে আখ্যাত, কোথাও সরস্বতীর শিষ্য স্বয়ং ব্রহ্মা। পদ্মপুরাণের 'সৃষ্টিখন্ডে' আছে একদা 'ভার্গব 'নামে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আর 'হেহয় 'নামে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে বাড়বাগ্নির উৎপত্তি হয়। তাতে পৃথিবী ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। দেবতারা চিন্তিত হয়ে সমস্যার সমাধানের জন্য বিষ্ণু বা শিবের কাছে যান। শিব তাদের সরস্বতীর শরণাপন্ন হতে বলেন। এক্ষেত্রে সরস্বতী এক শর্তের দাবি করেন। যদি শিষ্য ব্রহ্মা রাজি থাকেন তো তিনি নদী রূপ ধারণ করে বাড়বাগ্নিকে শান্ত করবেন। দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাদের প্রার্থনা জানালে ব্রহ্মা সরস্বতীকে নদী রূপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানাতে রাজি হলেন।সরস্বতী ও রাজি হলেন।শিব একটি পাত্রে বাড়বাগ্নি রেখে সরস্বতীকে দিলেন এবং বলে দিলেন প্লক্ষ গাছ বা পিপল গাছ থেকে সরস্বতীকে নদী রূপে প্রবাহিত হতে হবে। অতএব দেবী সরস্বতী বাড়বাগ্নি সহ পাত্রটি হাতে নিয়ে পিপল গাছে মিশে গেলেন এবং নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে রাজস্থানের পুষ্করের দিকে অগ্রসর হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশলেন,বাড়বাগ্নিও সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হল এবং পৃথিবী শান্ত হল।

সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে বেদের বিভিন্ন ধারাগুলি রচিত হচ্ছিল। এমন একটা সময় এল যখন বেদের আচরিত ধর্মকে সরস্বতী বিদ্যা নাম দেওয়া হল। মন্ত্রে বর্ণিত হল ,'যেমন নাকি বৃহৎ সরস্বতী নদীতে ছোট

ছোট নদীর বিলয় হয়েছে,তেমনি ব্রহ্মবিদ্যাতে সকল জ্ঞানের বিলয় এবং সরস্বতী বিদ্যাই হল ব্রহ্মবিদ্যা।মন্ত্রে ঋষি বলেছেন,'হে বিদ্বান মানুষ,সরস্বতী বিদ্যার প্রতিটি ঊর্মি তোমার রক্ষক হোক,মধুময় হোক তোমার জীবন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের এক প্রধান দেবী রূপে এলেন সরস্বতী বিভিন্ন নাম রূপে। সারদা, বীণাপাণি,বিদ্যাদেবী,বাগ্‌দেবী,হংসবাহিনী,ভারতী,কমলাসনা,বাণী ইত্যাদি।

দেবী সরস্বতীর চার হাত। দুই হাতে বীণা, বাকি দুই হাতে অক্ষমালা এবং বেদ। শতপথ,ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণগুলিতে সরস্বতীর দেবীত্ব ভীষণভাবে প্রকটিত।   হংসবাহিনী সরস্বতী যেমন বাংলায়,তেমনি দক্ষিণ ভারতে দেবী সরস্বতী ময়ূরবাহনা। হিন্দু ধর্ম ছাড়াও বৌদ্ধ,জৈন, তন্ত্রে দেবী বন্দিত হন বিভিন্ন রূপে,বর্ণে। ভারতের বাইরে সুমাত্রা,জাভা, জাপানে সরস্বতী পূজার চল আছে। তবে সব ধর্মেই দেবী সরস্বতী মূলতঃ বিদ্যাদায়িনী। যেহেতু বেদের মন্ত্রগুলি সুরে ছন্দে গাওয়া হত,তাই দেবী সুরের দেবী।

একদা মহিমোজ্জ্বল সরস্বতী নদী ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু সরস্বতী নদীর দেবীত্ব যা রয়ে গেল তা আজও এই একবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসী দেশে - বিদেশে   তদ্গত চিত্তে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করে চলেছ

"সরস্বতী মহাভাগে
বিদ্যে কমললোচনে
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী
বিদ্যাং দেহি, নমোহস্তুতে।”

সূত্র গ্রন্থ;(১)-'সরস্বতী নদী, অনুসন্ধান ও আলোক প্রাপ্তি। মূল মারাঠী এক এক লেখক-অধ্যাপক ডঃ আনন্দ ডামলে। বঙ্গানুবাদ -ডাঃ গুরুপদ শান্ডিল্য। সম্পাদনা -ডঃ দেবলীনা রায়(এম এ, পি এইচ ডি। প্রকাশক -বাবা সাহেব (উমাকান্ত কেশব) ,আপ্তে স্মারক সমিতি ট্রাস্ট।

(২)-লুপ্ত সরস্বতী, মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়,সিগনেট প্রেস।

(৩)-বৈদিক সভ্যতা, ইরফান হাবিব, বিজয় কুমার ঠাকুর।ভাষান্তর -কাবেরী বসু। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

(৪)আর্য দিগন্তে সিন্ধু সভ্যতা। রজত পাল। তুহিনা প্রকাশনী

Poems

They

Soumyanetra

Usually phone calls in the wee hours of the morning
Bring lurking fears right into your bedroom
The phone rang and even before I received it
I almost knew the news
They called from the hospital…

Strange I didn't want to look at ma
She looked so white
So bloated
So disproportionate
And her head was turned away from me
Like she didn't have the heart to talk to me…

They wrapped her in white
And led her out from a different exit
One that we hadn't seen before
One that didn't have visitors jostling in the lifts
Or the ardent ones
Offering prayers to the idol
That religiously guarded the entry
To the path that could
Either lead you back to earth
Or take you to some unknown land…

Ma who was scared
Even of getting into an MRI machine
Was hurriedly carried away
Like some ominous secret
Like a child born out of wedlock
Whose existence they want to

Wash their hands off from
Like wiping off the last blood stain
After a heinous murder
And she didn't even protest…

They had it all decorated with white flowers
The ones she loved the most
And they kept her on the road
In the blistering sun
No one cared that she might get scorched
But they led us in the shade
To get things signed
And have the papers in order…

Instead of cream on her face and forehead
And vaseline on her lips
Like I usually used to apply,
They asked me to apply
Ghee, from a big bottle
Even on her toes and legs
Like greasing the wheels of the vehicle
That will take her to some unknown land…

মেলবন্ধন

অর্পিতা সিংহ চৌধুরী

শব্দ ও সুর ছিলই আমার,
একে একে সুর-শব্দ তোমায়
সমস্ত দিয়েছি!
সুর দিয়ে তুমি তান বেঁধেছ,
শব্দ নিয়ে কবিতা।

একদিন সুর-শব্দ সমস্ত
বড় অভিমানী হল অবহেলায়--
তারা আর ধরা দিল না
তোমার হাতে!
ধীরে ধীরে তুমি নিঃস্ব হলে--
বারে বারে ফিরে চাইলে
ছেঁড়া তার আর শূন্য পাতায়--
পেলে না আর কিছুই!
আর তোমার সুর সাধা,
শব্দ বাঁধা হলো না!
সুর-শব্দেরা যে যার
একে একে তাদের যোগ্য সাধককে
বরণ করলে,
তুমি রয়ে গেলে একা!

In the car

Soumyanetra

The heart that pumped blood into mine has stopped
The umbilical cord that held me firmly inside the womb
Was now just ashes…

I had taken her in the car a couple of months back
To the nearby hospital
Sat beside her
Held her tight
She panted and gasped for air
I had pumped oxygen in her mask
From the portable cylinder
Till we reached the hospital…

A couple of months later
I once again sat beside her in the car
This time she was not panting
Or gasping for air
She looked happy and peaceful
The man in the photo shop held an umbrella over her
While they helped her in the car
This time also I held her tight
She sat framed in a photograph beside me…

Rains

Soumyanetra

Do you really know what the rains are?
I am not so sure I do
It was raining on Shasthi
And everyone seemed so unhappy
For me though I wasn't sure
Who knows what the rains are
One moment the cold water
Felt like ma rebuking me
For I wasn't putting on something new
Then it felt like liquid love
From baba and ma
And didan and mamabhai,
If a grain of sand can hold
The soul of the universe
I'd bet my life
A drop of rain can bring
All of them to me
Who knows how they perceive me
Who knows therefore
How they expect me to perceive them
And I feel the drops tell me
So many things
In so many tongues
In so many forms
After all, I didn't learn their language
I am sure they were bringing
Ma's laughter to me
And her songs
And her strokes
And her magic reading my mind

Telling me therefore
I should not miss her
As much as I am
That she's just assumed a form
I haven't seen her in before
Just speaking a tongue
I haven't learnt before, that's all…
The rains, I mean
All felt so living
All felt like carrying so much with them
In their tiny sparkles
Didn't I see a thousand hugs hidden
In their incessant pitter patter
Didn't I hear the music of lands
That lay beyond
What my limited body can perceive
That wet smell
That permeates all senses
Don't they feel just like ma's saree
And I am really not sure anymore
What the rains actually are…

List of books by Rita Chattopadhyay (by year of publication)

Sr. No.	Book Name	Author/Editor	Year of Publication
1.	A Study on Candravansam	Dr. Rita Chattopadhyay	1988
2.	Mahamahopadhyaya Haridasa Siddhantavagisa An Appraisal	Dr. Rita Chattopadhyay	1989
3.	Modern Sanskrit Dramas of Bengal [20th Century A.D]	Dr. Rita Chattopadhyay	1992
4.	Gangadhara Kaviraja (1798 A.D-1885 A.D)	Dr. Rita Chatopadhyay	1995
5.	শ্রীবিষ্ণুশর্মাপ্রণীতম্ পঞ্চতন্ত্রম্ [অপরীক্ষিতকারকম্]	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায় ডঃ বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়	1996
6.	Modern Sanskrit Plays [1970 A.D. - 1998 A.D.] A Sociological Introspection	Dr. Rita Chattopadhyay	1999
7.	পঞ্চতন্ত্রম্ [মিত্রলাভম্]	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায় ডঃ বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়	2002
8.	পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের সারস্বত সাধনা	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2004
9.	Modern Sanskrit Literature Some Observations	Dr. Rita Chattopadhyay	2004
10.	Technical Terms in Sanskrit Literary Criticism and Aesthetics	Dr. Rita Chattopadhyay Dr. Bijoya Goswami	2005
11.	সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা) ও তাঁর রচিত অথ কিম্	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2006
12.	সীতানাথ আচার্য [কবি ও প্রাবন্ধিক]	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2008
13.	20th Century Sanskrit Literature A glimpse into Tradition and Innovation	Dr. Rita Chattopadhyay	2008
14.	কাব্যমীমাংসা	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2010
15.	আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ১৯১০-২০১০ ছোটগল্প ও নাটক	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2012
16.	মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সারস্বত সাধনা	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2013
17.	গুরুনাথ বিদ্যানিধি (১৮৬২ - ১৯৩১)	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2016

18.	Encyclopedia of Ancient Indian Dramaturgy	Dr. Rita Chattopadhyay Dr. Bioya Goswami	2016
19.	সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2017
20.	নাটকলক্ষণরত্নকোষ	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2017
21.	শ্রীজীব ও চিপিটকচর্বণম	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায় সৌম্যজিৎ সেন	
22.	আধুনিক সংস্কৃত কাব্য: বাঙালী মনীষা শতবর্ষের আলোকে	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2018
23.	G.B. Palsule (1921-2005)	Dr. Rita Chattopadhyay	2019-20
24.	মহাভারতের নির্বাচিত গল্প	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2020
25.	Haridasa Siddhantavagisa	Dr. Rita Chattopadhyay	2021
26.	শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2021
27.	বিদুষী বঙ্গনারী রমা চৌধুরী (১৯১২-১৯৯১)	ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়	2021
28.	Nityananda Smrititirtha (1923-2008) A Centenary Commemoration Volume	Dr. Rita Chattopadhyay & Dr. Soma Basu (Edited)	2022

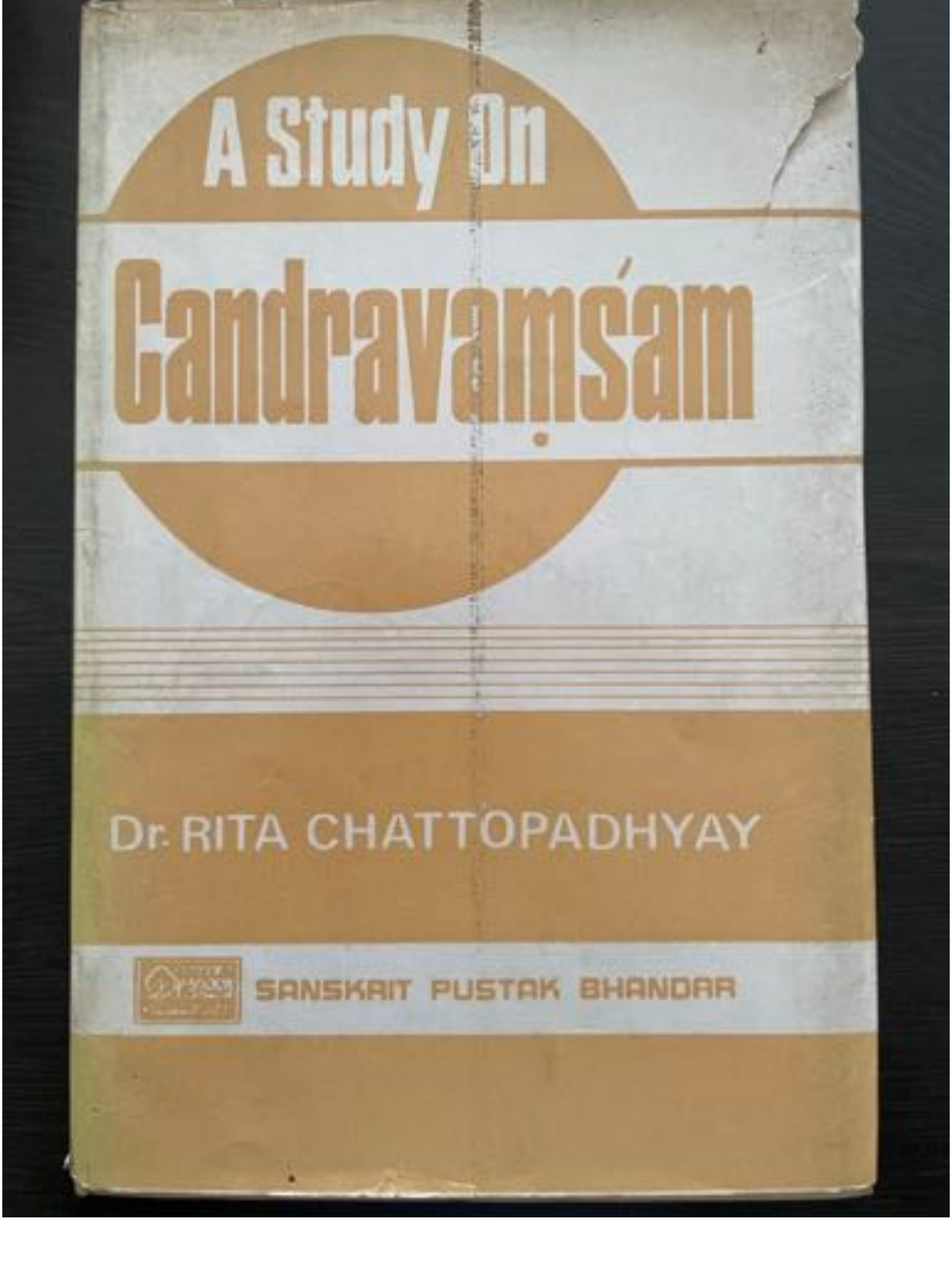
A Study On
Candravaṃśam
Dr. RITA CHATTOPADHYAY
SANSKRIT PUSTAK BHANDAR

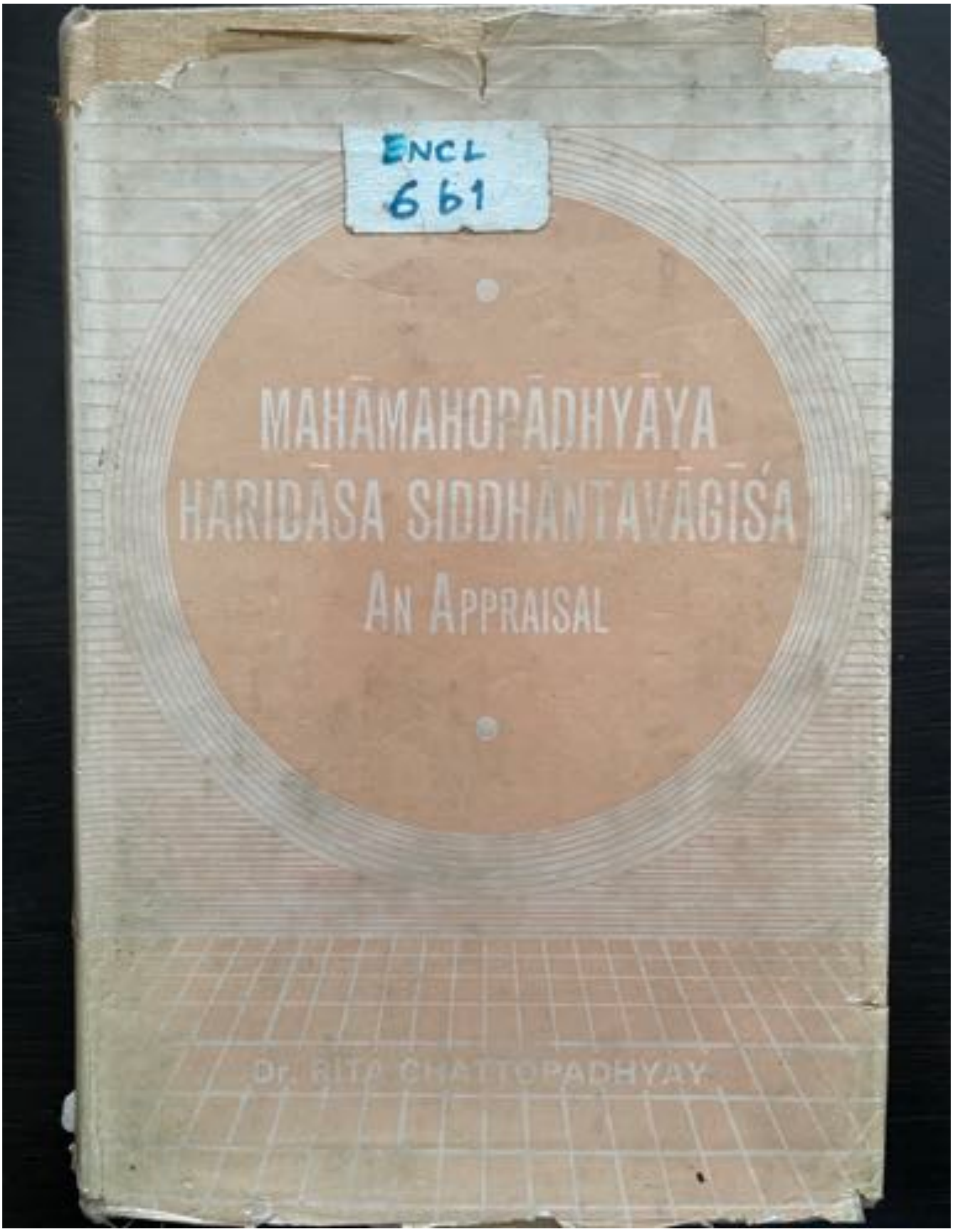
ENCL
661
MAHĀMAHOPĀDHYĀYA
HARIDĀSA SIDDHĀNTAVĀGĪŚA
AN APPRAISAL
Dr. RITA CHATTOPADHYAY

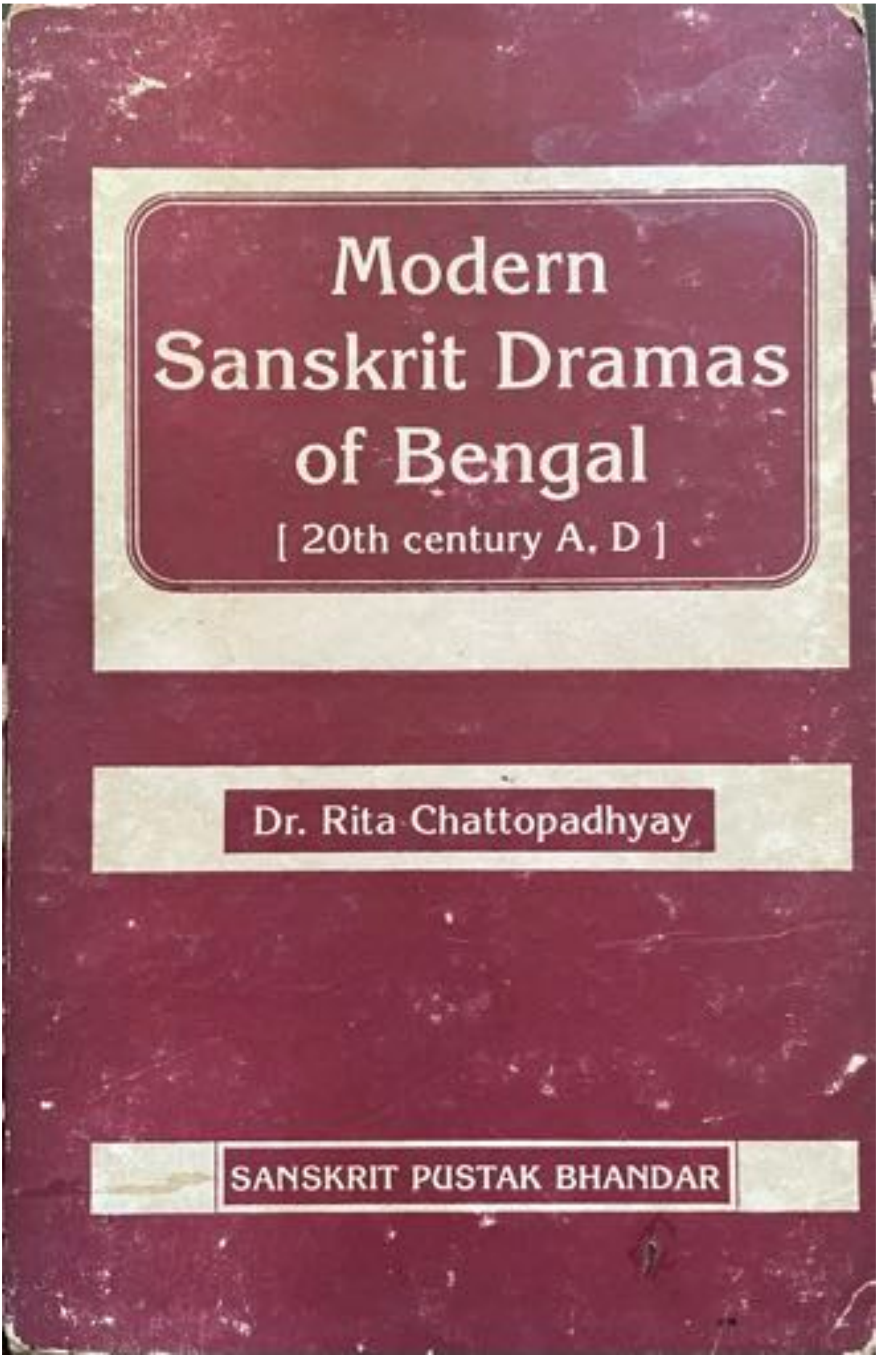
Modern
Sanskrit Dramas
of Bengal
[20th century A. D]
Dr. Rita Chattopadhyay
SANSKRIT PUSTAK BHANDAR

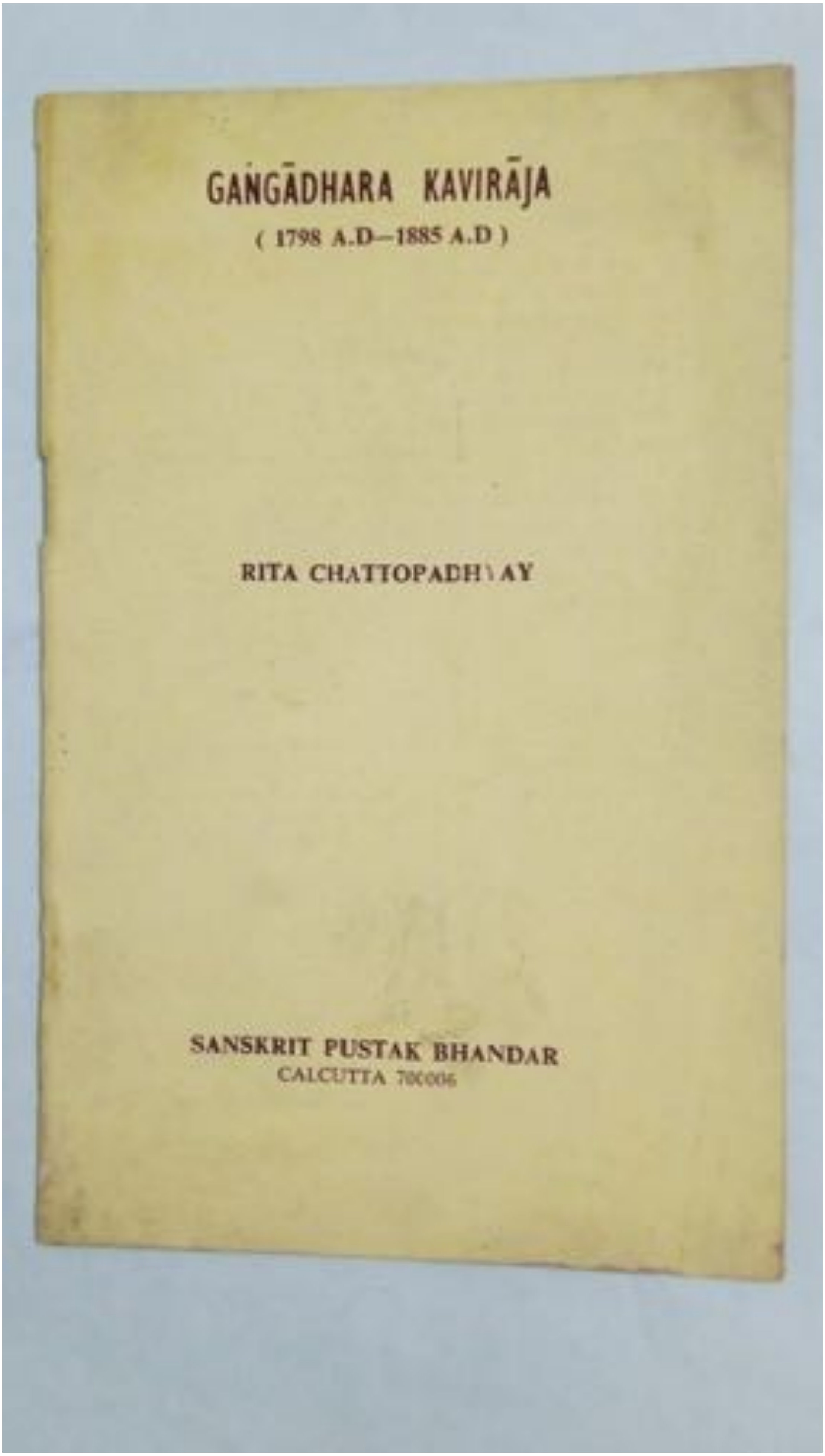
GANGĀDHARA KAVIRĀJA
(1798 A.D–1885 A.D)
RITA CHATTOPADHYAY
SANSKRIT PUSTAK BHANDAR
CALCUTTA 700006

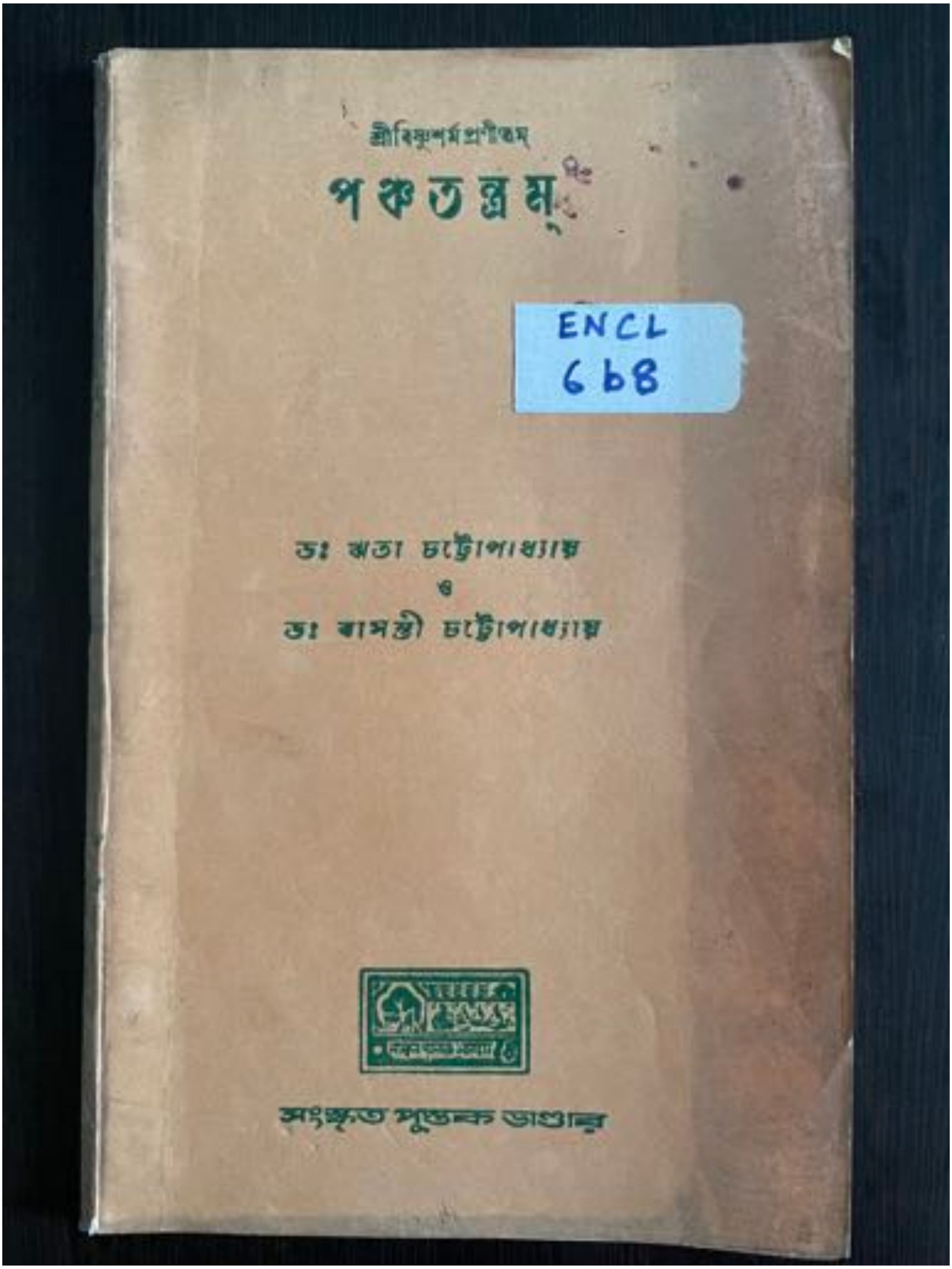
শ্রীবিষ্ণুশর্মপ্রণীতম্
পঞ্চতন্ত্রম্
ENCL
৬৮৪
ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়
ও
ডঃ বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

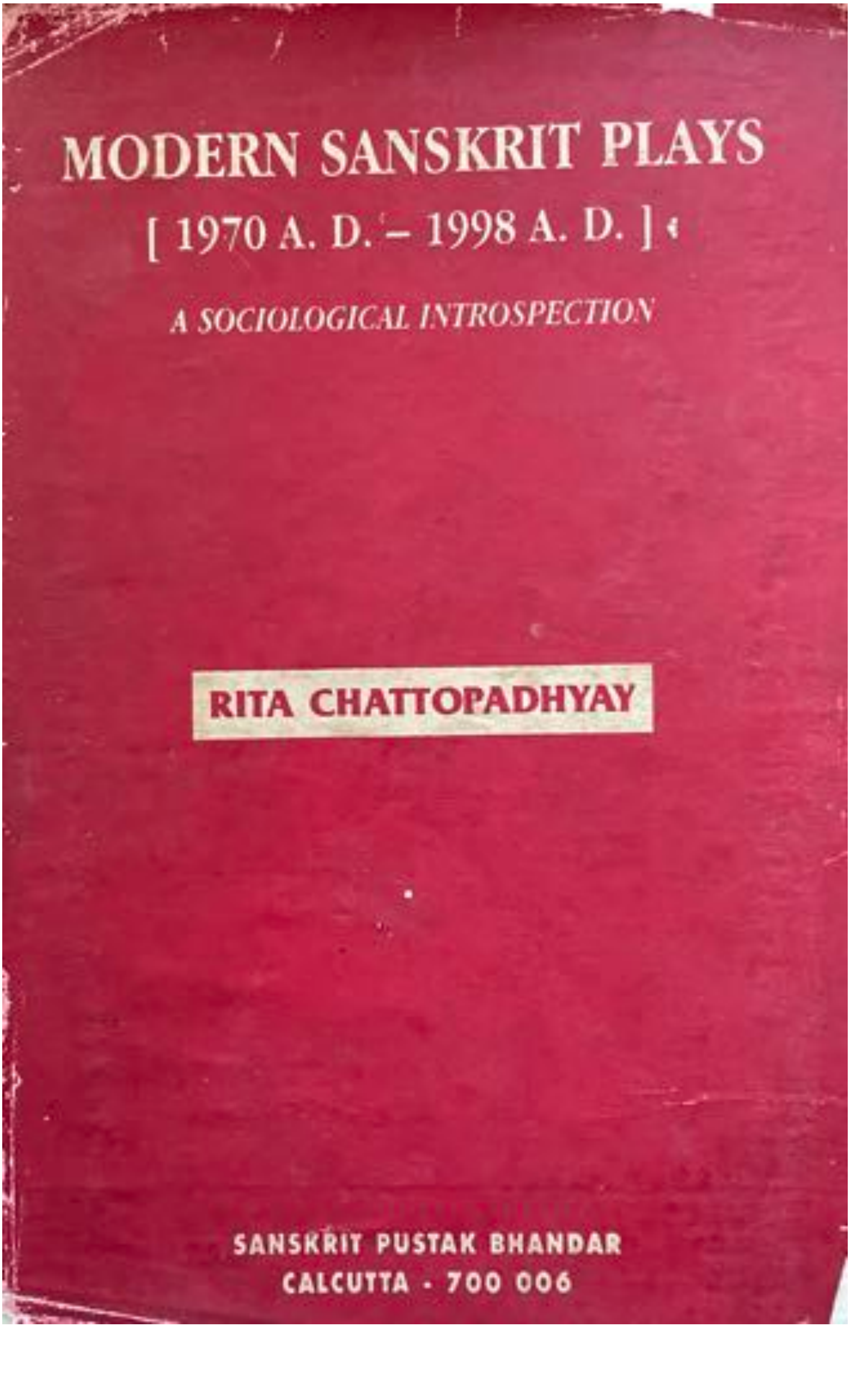
MODERN SANSKRIT PLAYS
[1970 A. D. – 1998 A. D.]
A SOCIOLOGICAL INTROSPECTION
RITA CHATTOPADHYAY
SANSKRIT PUSTAK BHANDAR
CALCUTTA - 700 006

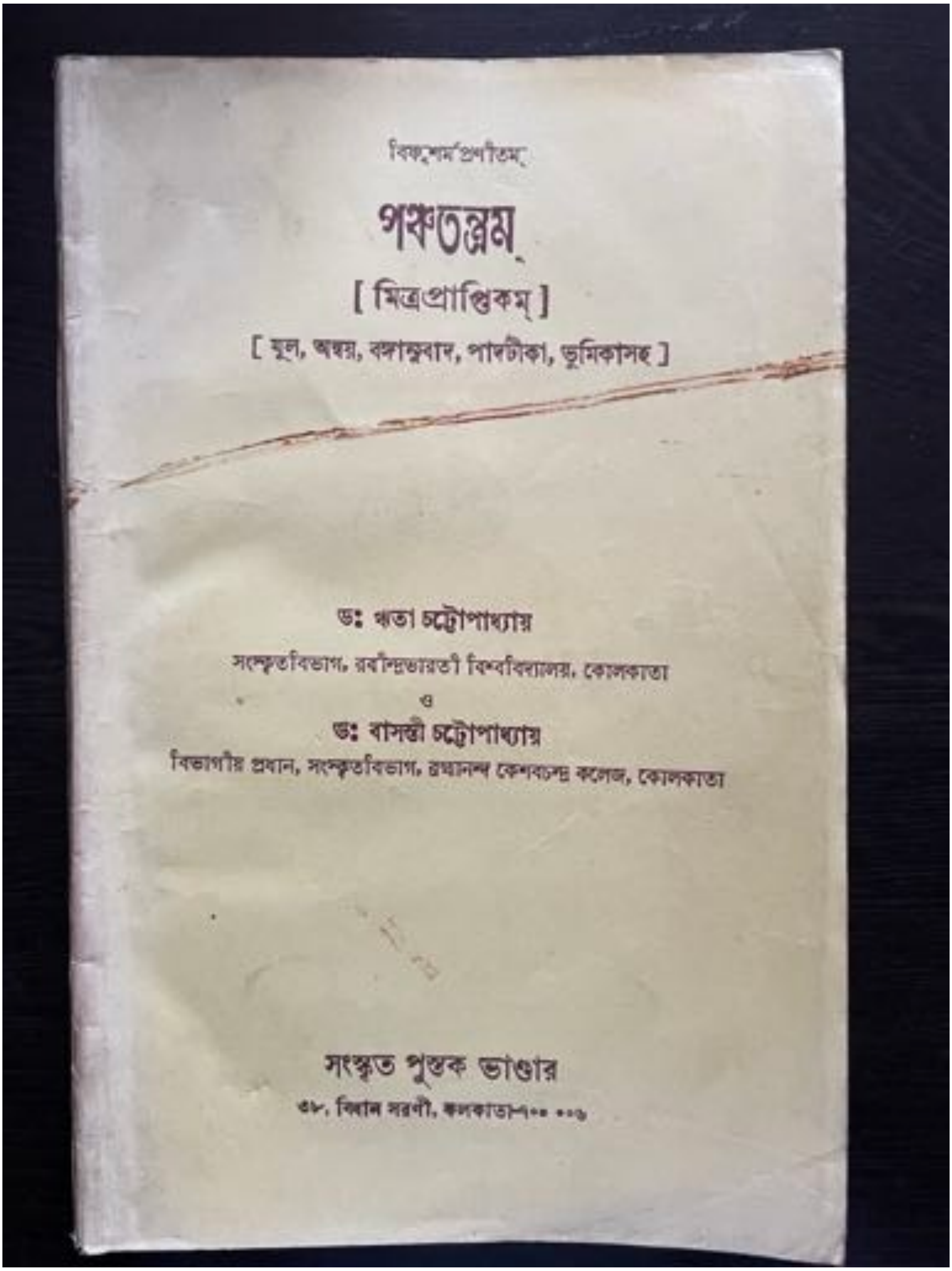
বিষ্ণুশর্মপ্রণীতম্
পঞ্চতন্ত্রম্
[মিত্রপ্রাপ্তিকম্]
[মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, পাদটীকা, ভূমিকাসহ]
ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়
সংস্কৃতবিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা
ও
ডঃ বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়
বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃতবিভাগ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ, কোলকাতা
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬

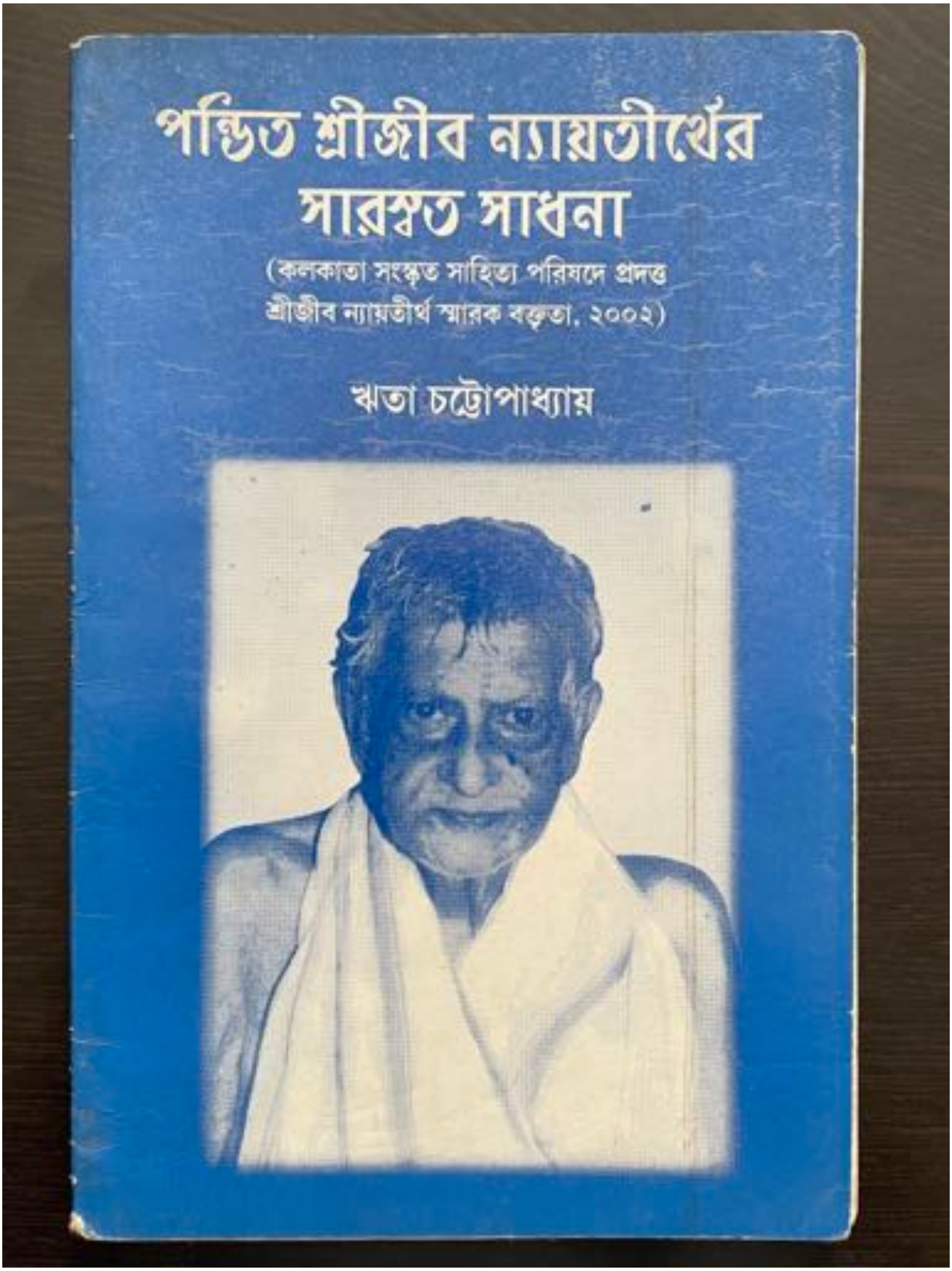
পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের
সারস্বত সাধনা
(কলকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ স্মারক বক্তৃতা, ২০০২)
ঋতা চট্টোপাধ্যায়

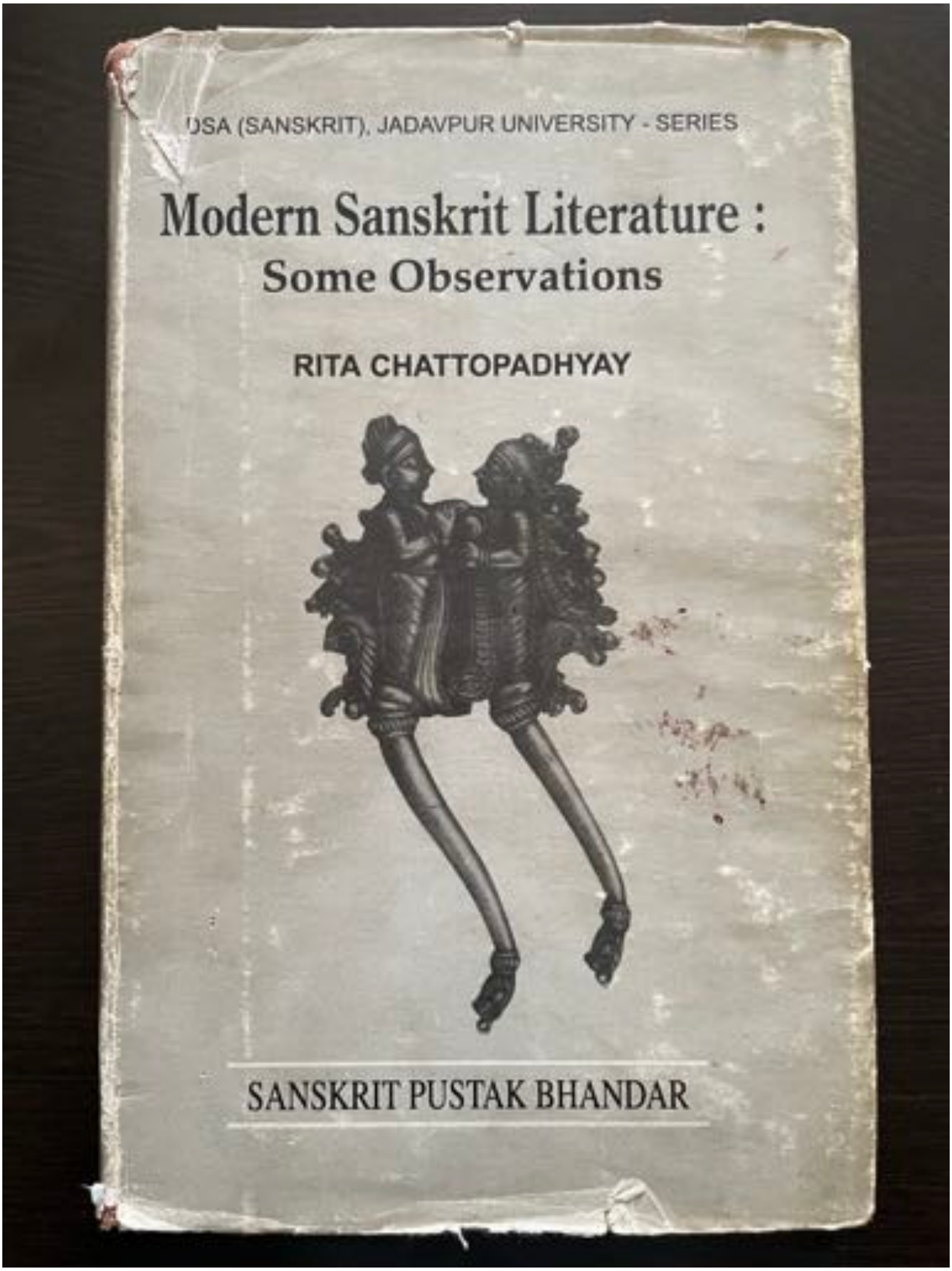
DSA (SANSKRIT), JADAVPUR UNIVERSITY - SERIES
Modern Sanskrit Literature :
Some Observations
RITA CHATTOPADHYAY
SANSKRIT PUSTAK BHANDAR

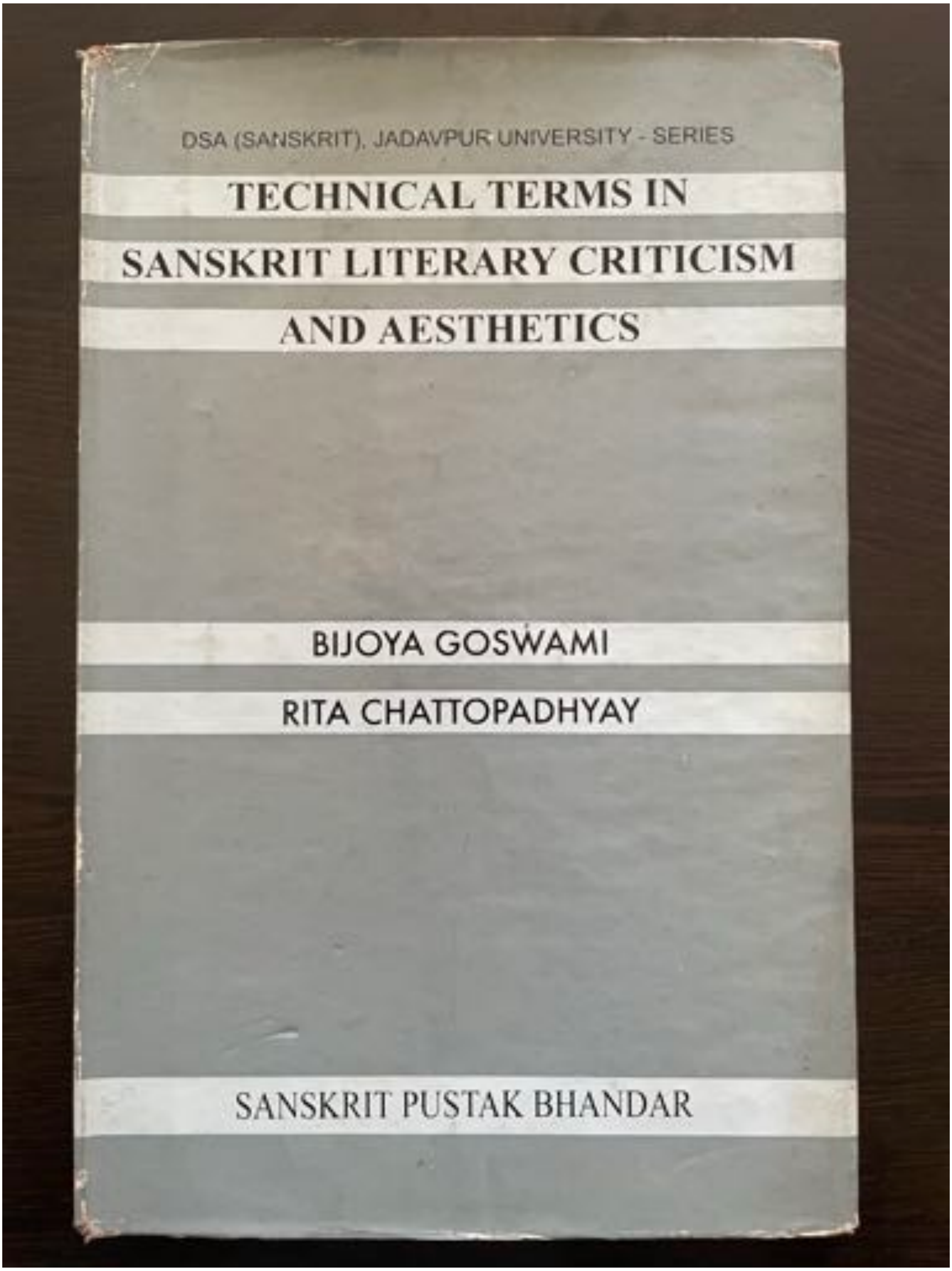
DSA (SANSKRIT), JADAVPUR UNIVERSITY - SERIES
TECHNICAL TERMS IN SANSKRIT LITERARY CRITICISM AND AESTHETICS
BIJOYA GOSWAMI
RITA CHATTOPADHYAY
SANSKRIT PUSTAK BHANDAR

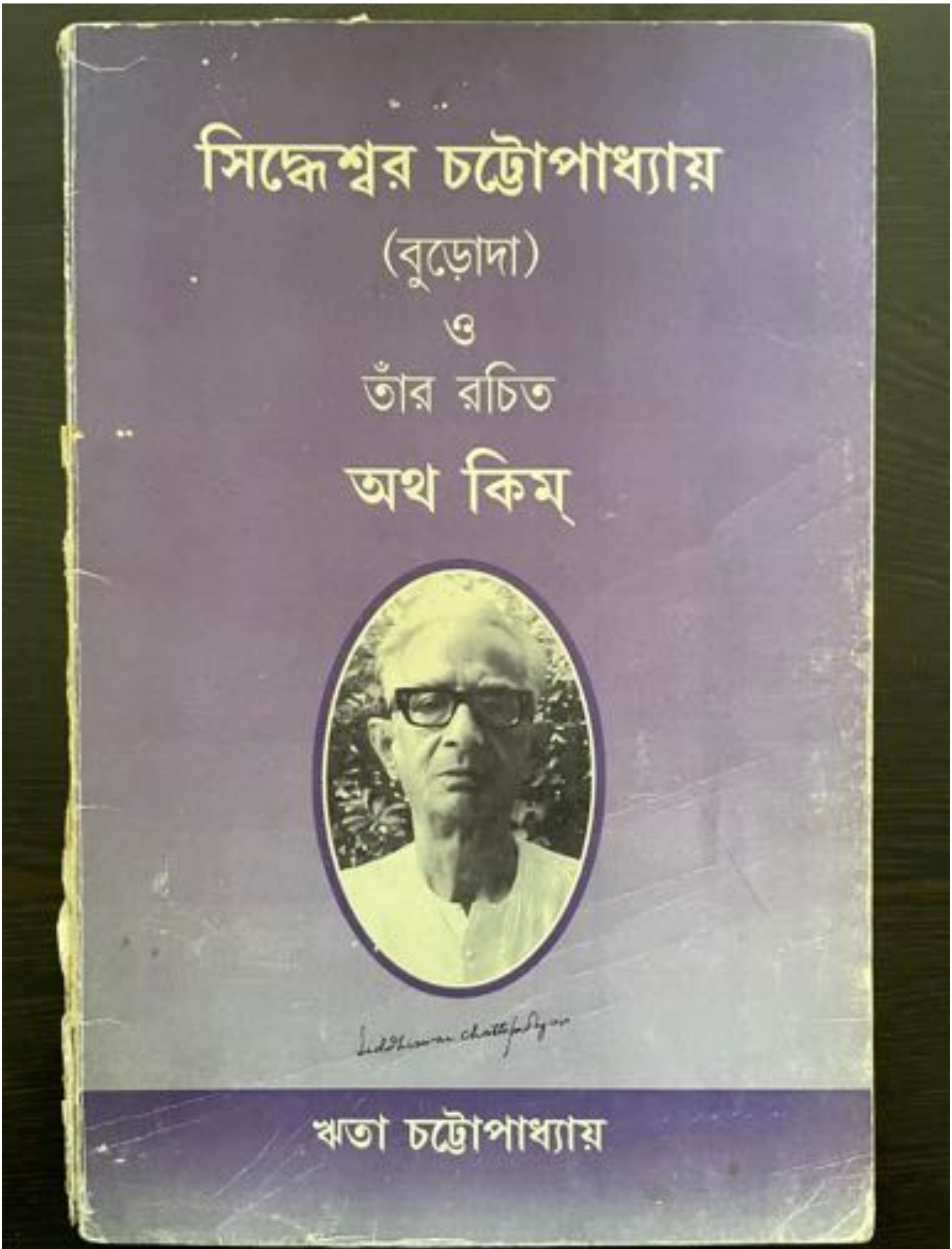
সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
(বুড়োদা)
ও
তাঁর রচিত
অথ কিম্
ঋতা চট্টোপাধ্যায়

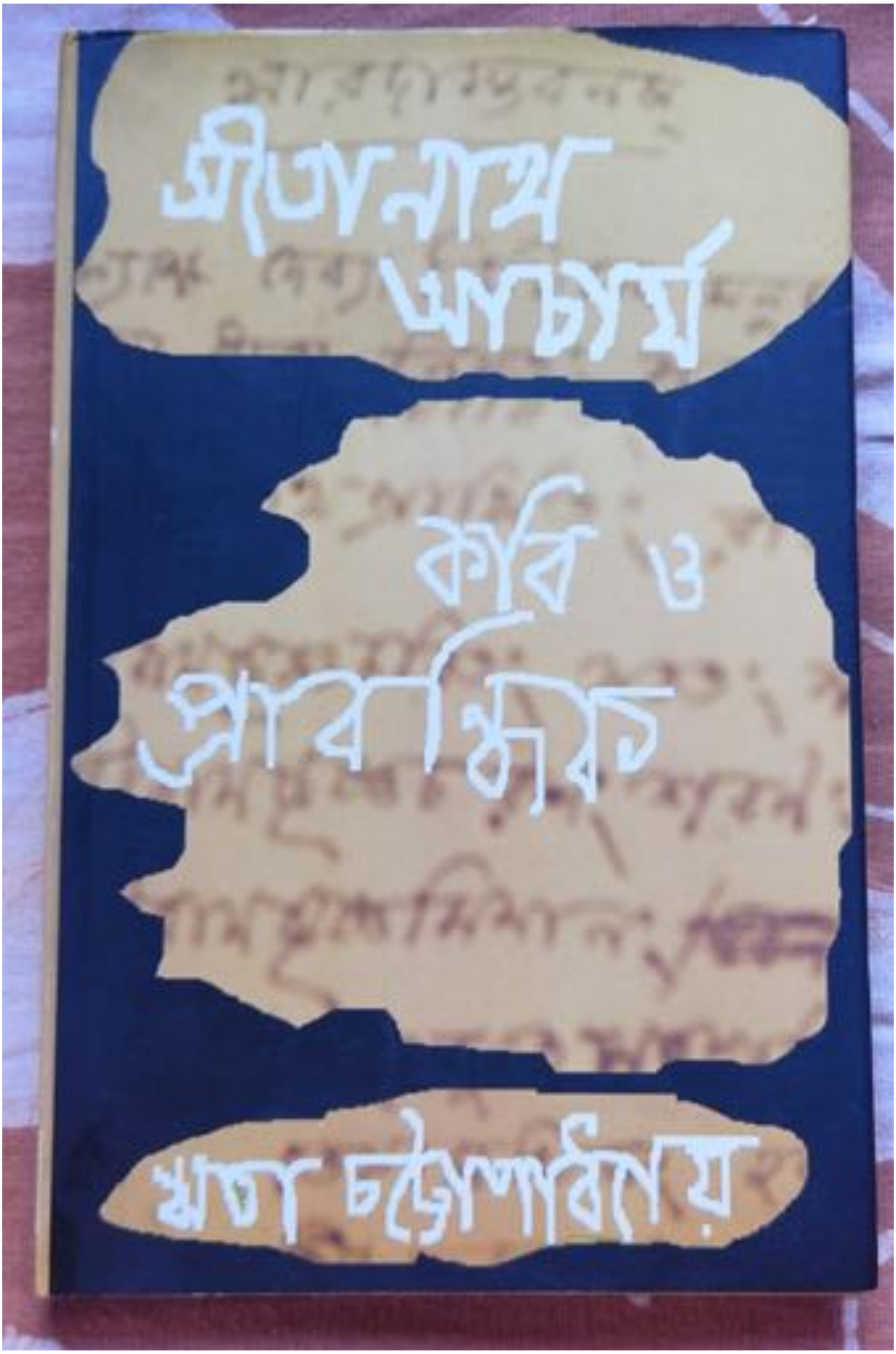

প্রীতিনাথ আচার্য
কবি ও প্রাবন্ধিক
ঋতা চট্টোপাধ্যায়

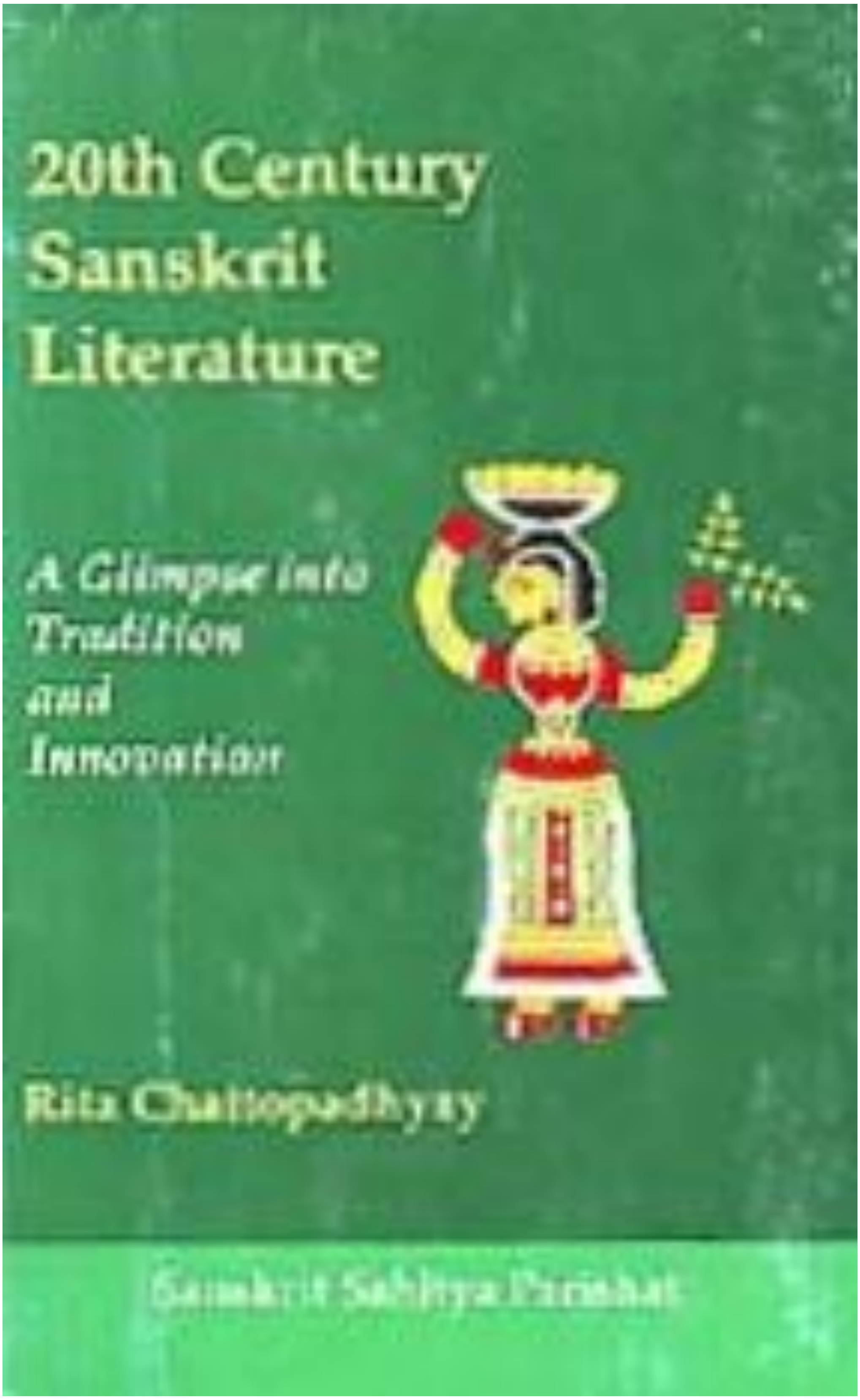
20th Century
Sanskrit
Literature
A Glimpse into
Tradition
and
Innovation
Rita Chattopadhyay
Sanskrit Sahitya Parishat

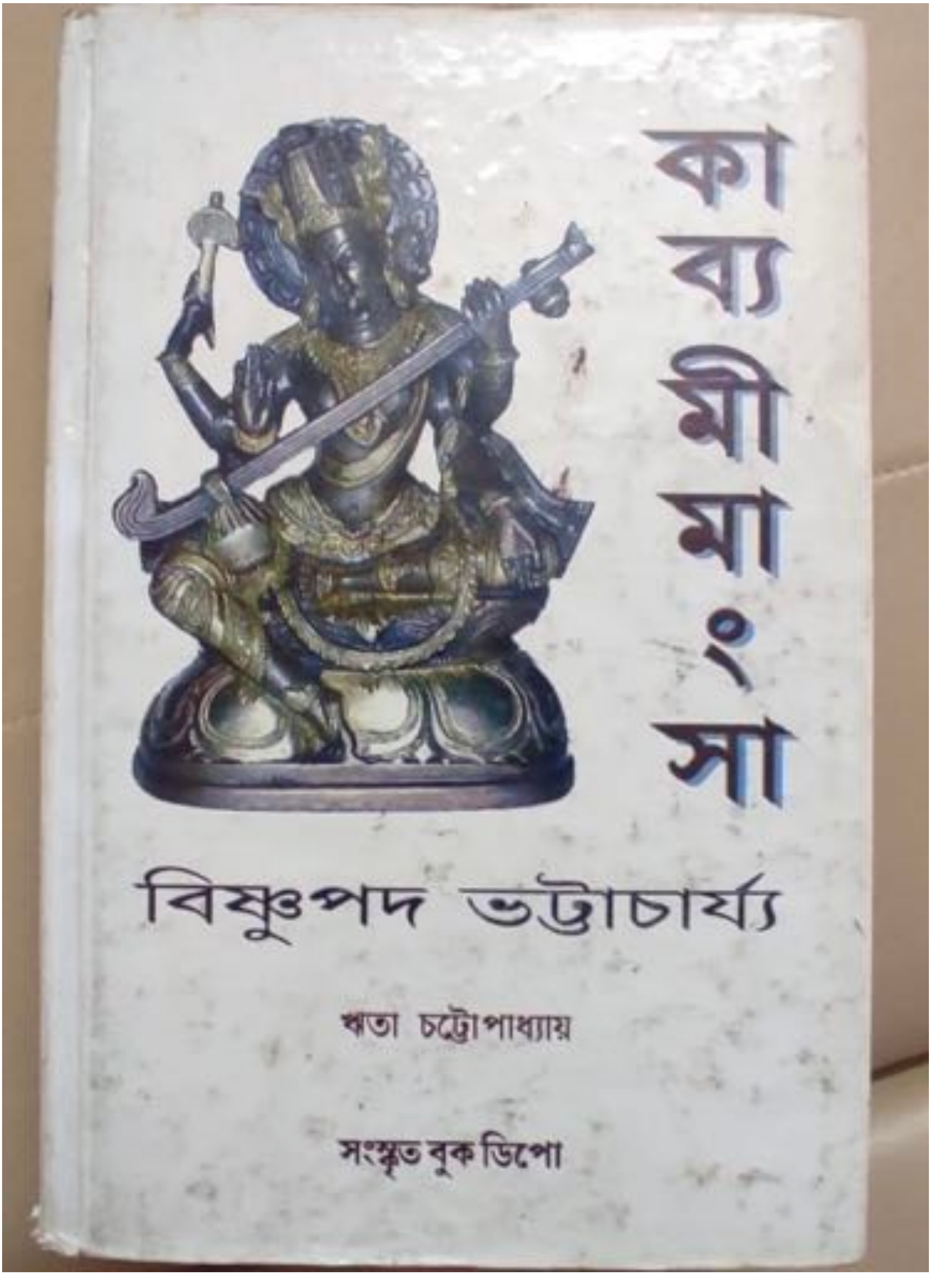
কাব্যমীমাংসা
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
ঋতা চট্টোপাধ্যায়
সংস্কৃত বুক ডিপো

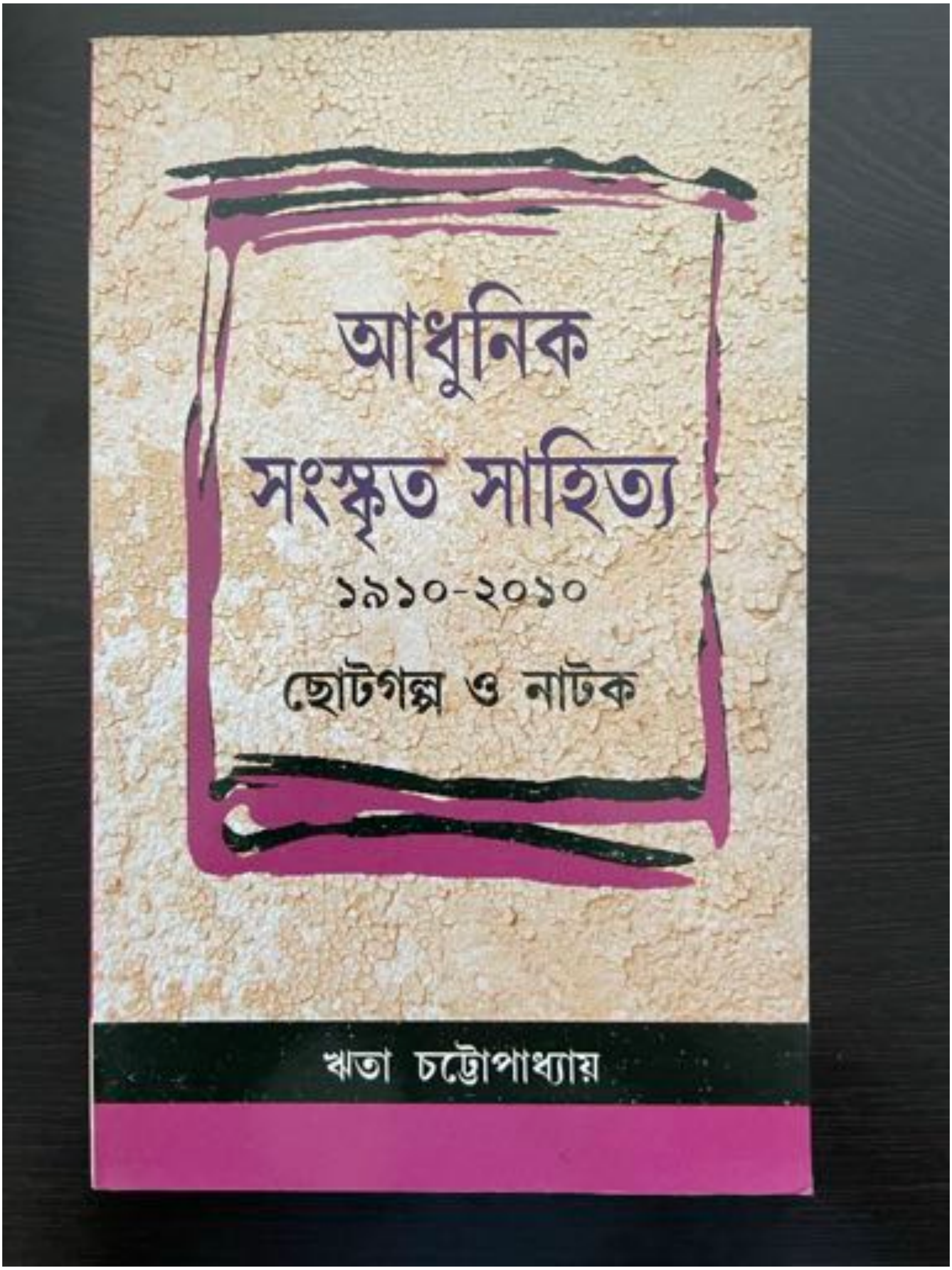
আধুনিক
সংস্কৃত সাহিত্য
১৯১০-২০১০
ছোটগল্প ও নাটক
ঋতা চট্টোপাধ্যায়

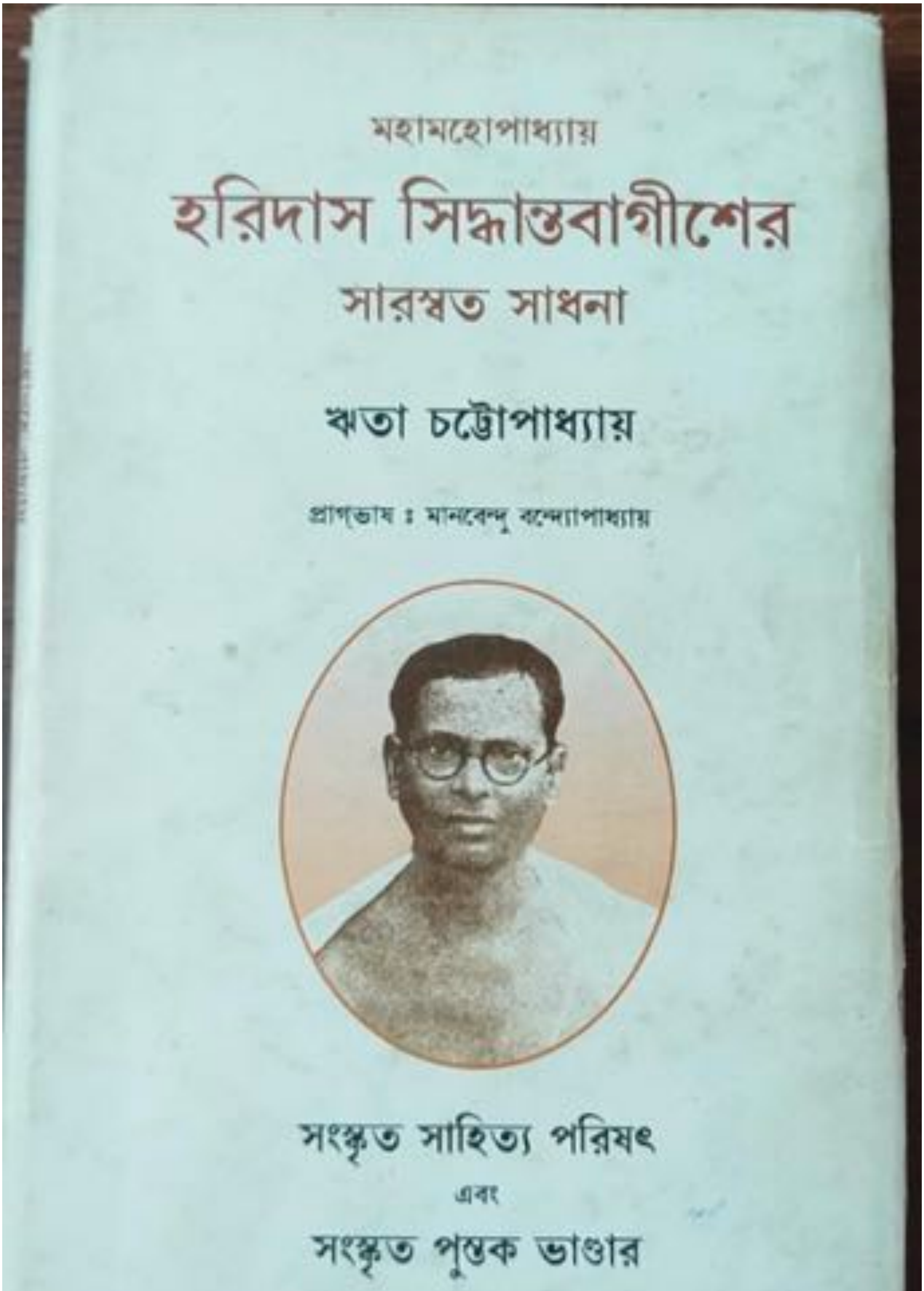
মহামহোপাধ্যায়
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের
সারস্বত সাধনা
ঋতা চট্টোপাধ্যায়
প্রাগ্‌ভাষ : মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ
এবং
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

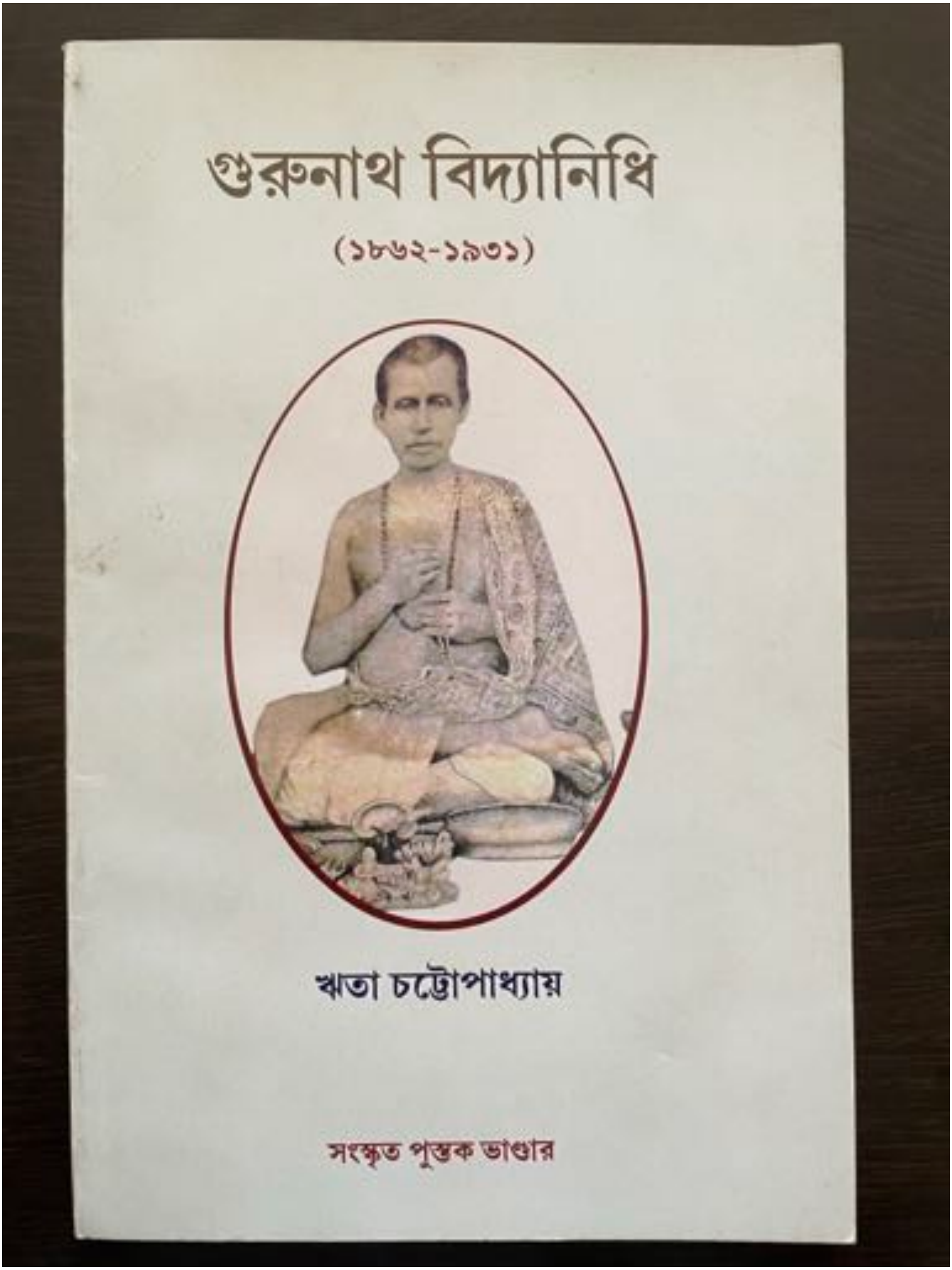
গুরুনাথ বিদ্যানিধি
(১৮৬২-১৯৩১)
ঋতা চট্টোপাধ্যায়
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

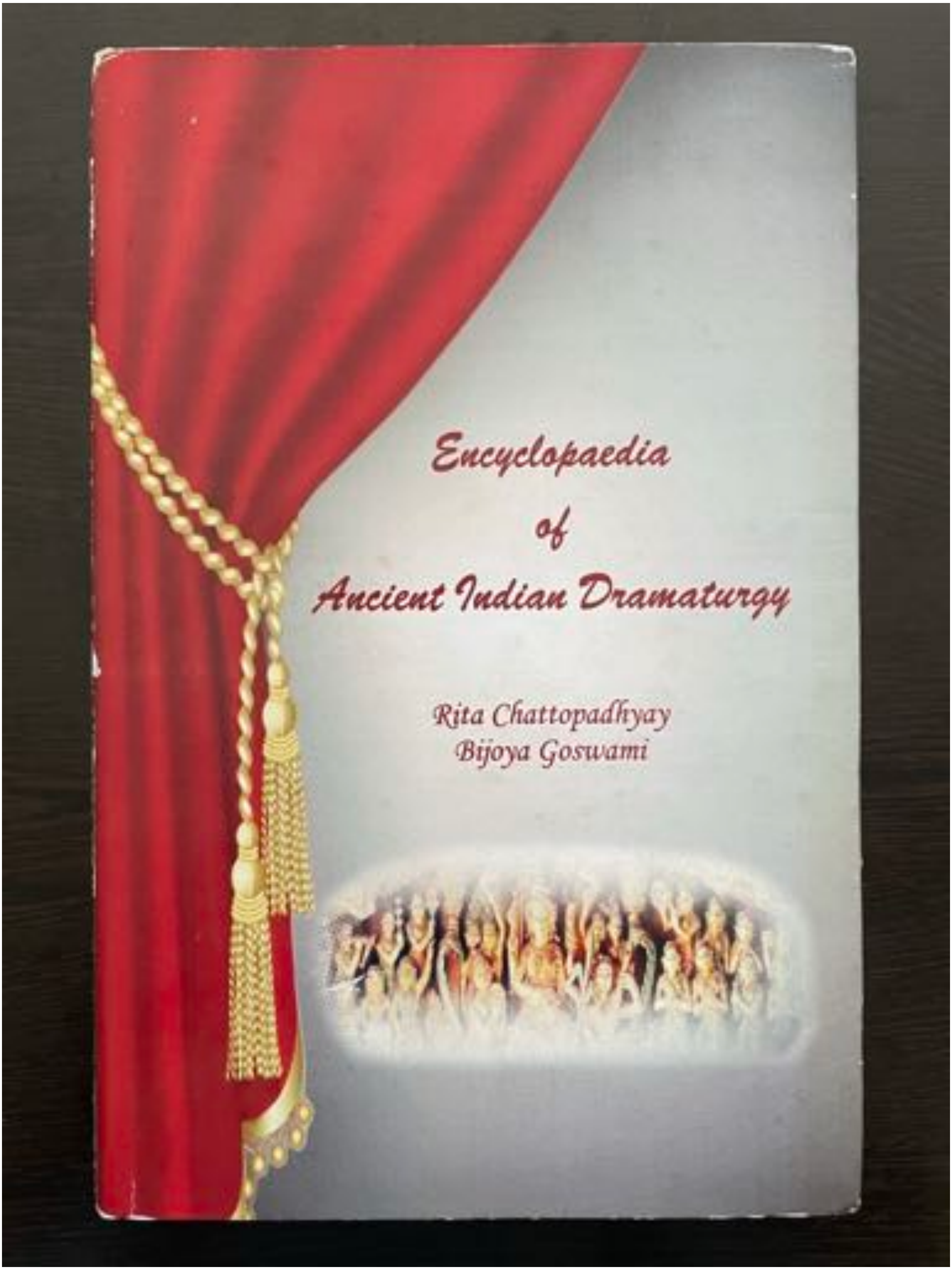
Encyclopaedia
of
Ancient Indian Dramaturgy
Rita Chattopadhyay
Bijoya Goswami

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
(বুড়োদা)
[১৯১৮ - ১৯৯৩]

ঋতা চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

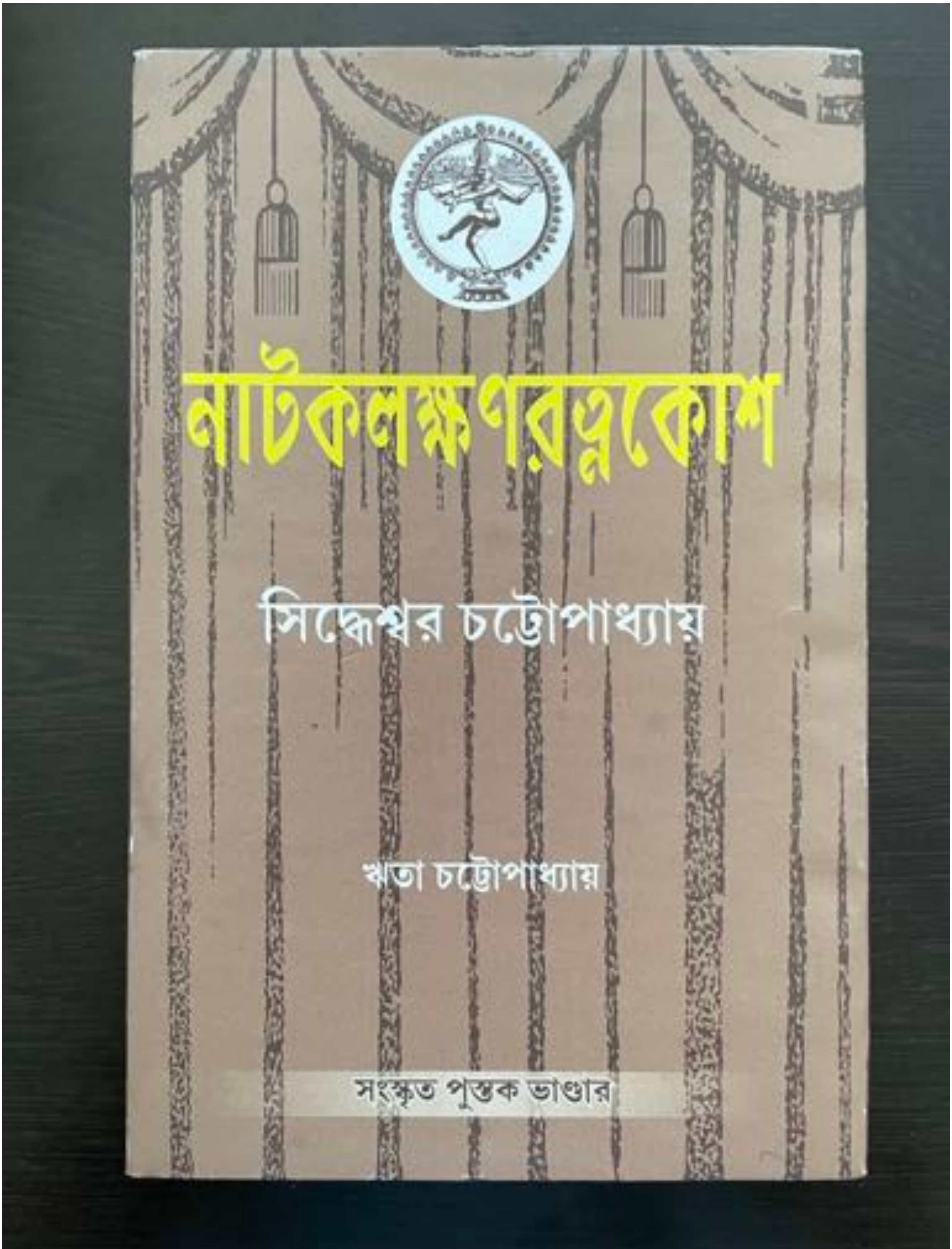
নাটকলক্ষণরত্নকোশ
সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
ঋতা চট্টোপাধ্যায়
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

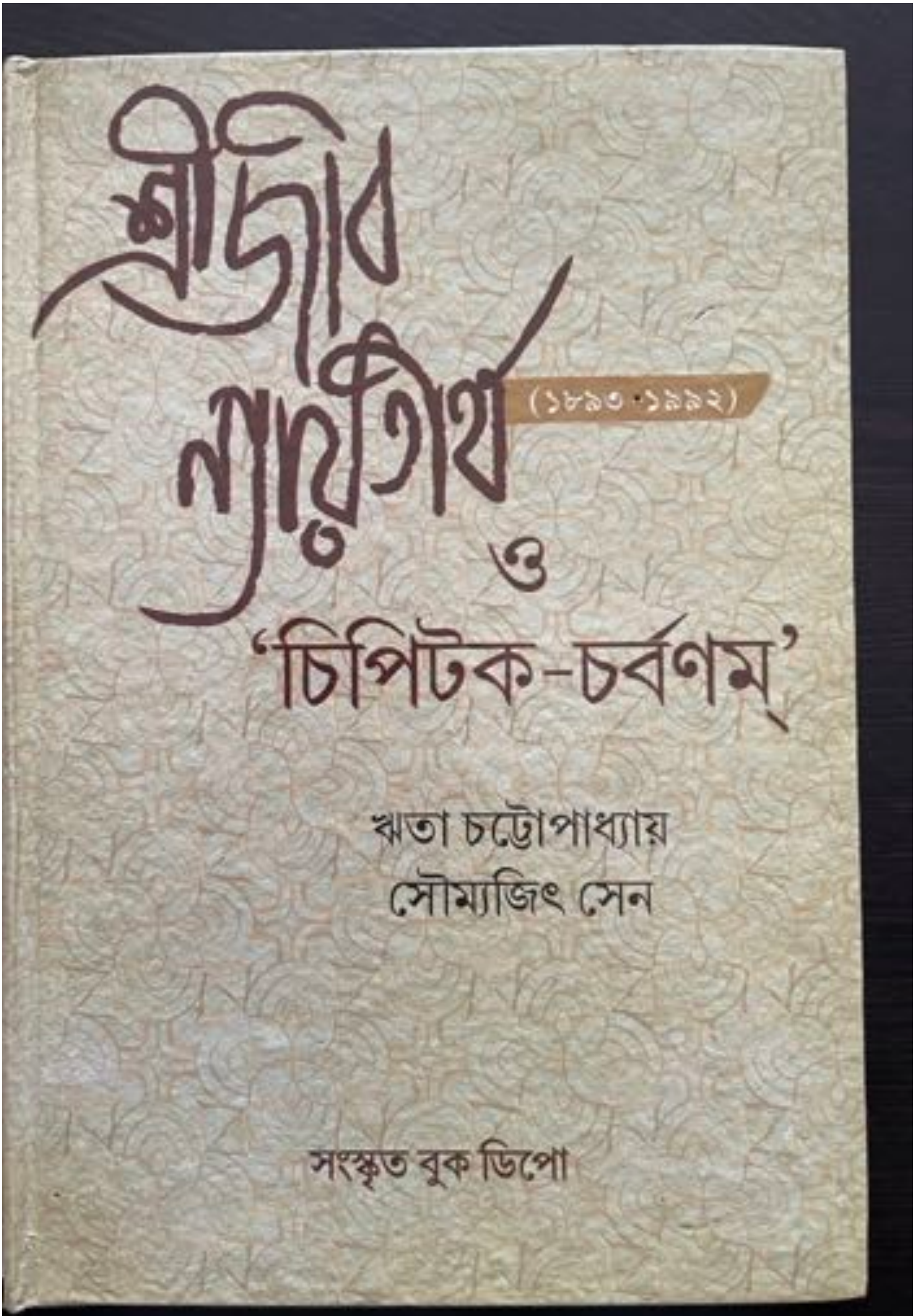
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ
(১৮৯৩-১৯৯২)
ও
'চিপিটক-চর্বণম্'
ঋতা চট্টোপাধ্যায়
সৌম্যজিৎ সেন
সংস্কৃত বুক ডিপো

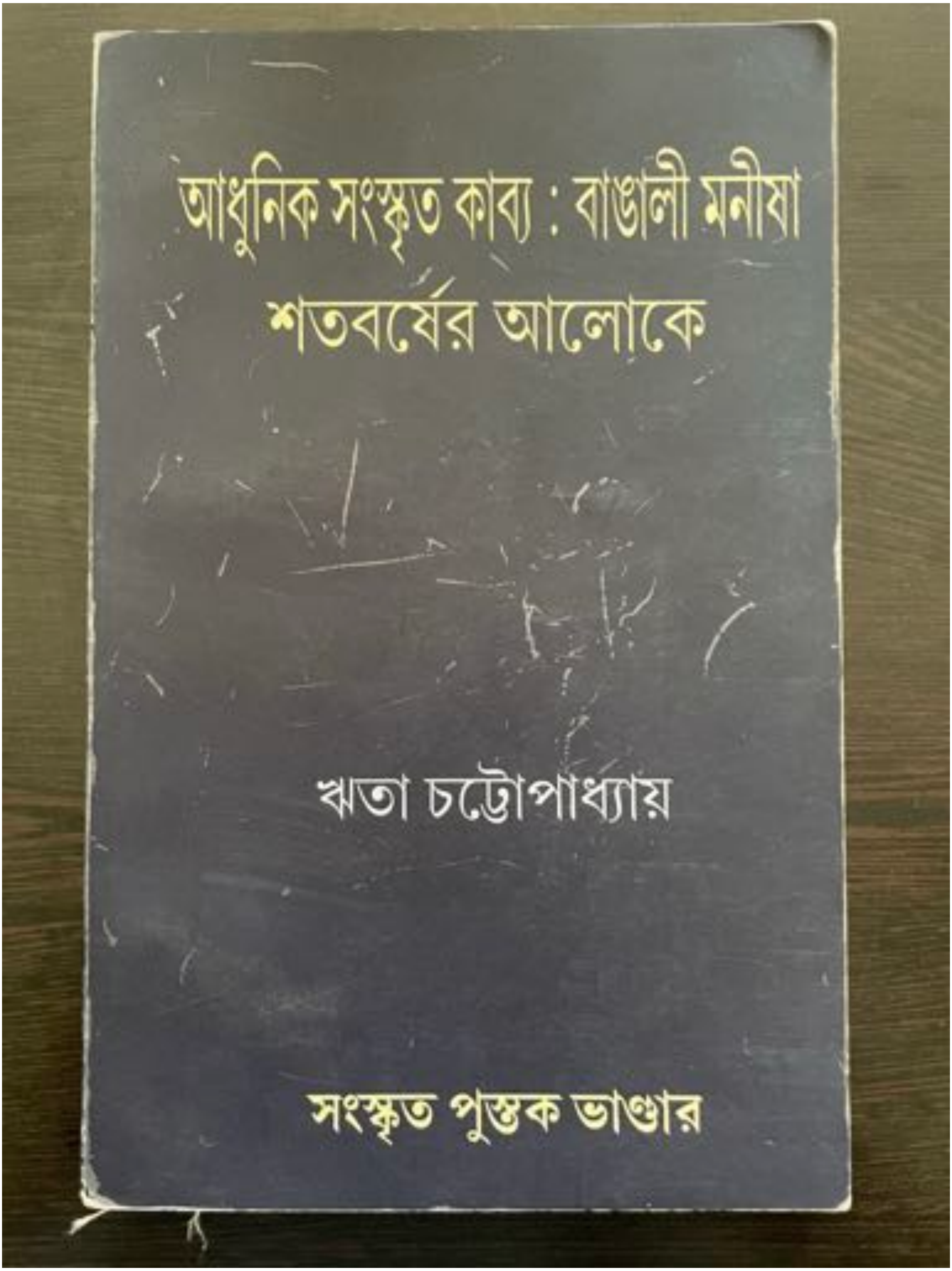
আধুনিক সংস্কৃত কাব্য : বাঙালী মনীষা
শতবর্ষের আলোকে
ঋতা চট্টোপাধ্যায়
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

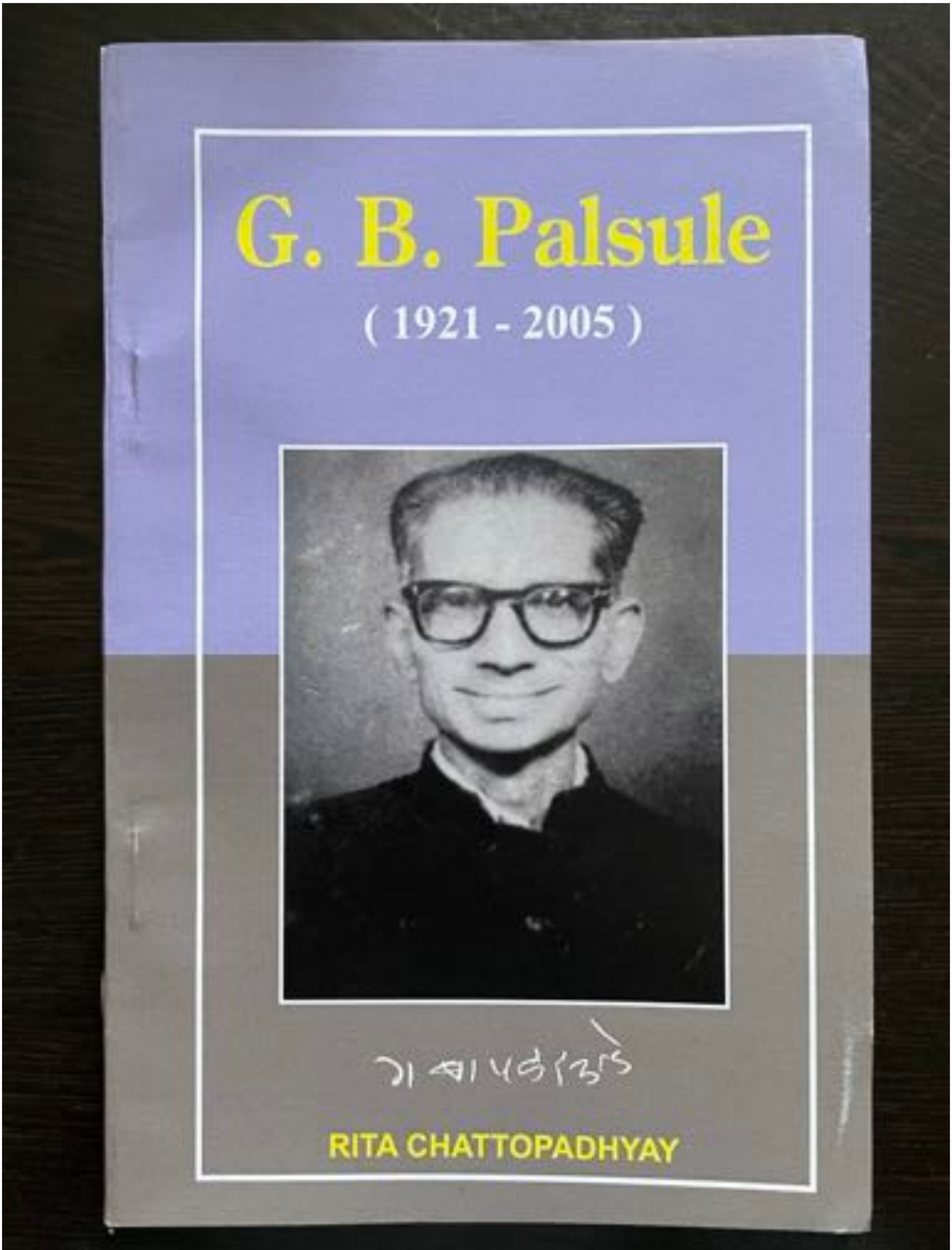
G. B. Palsule
(1921 - 2005)
RITA CHATTOPADHYAY

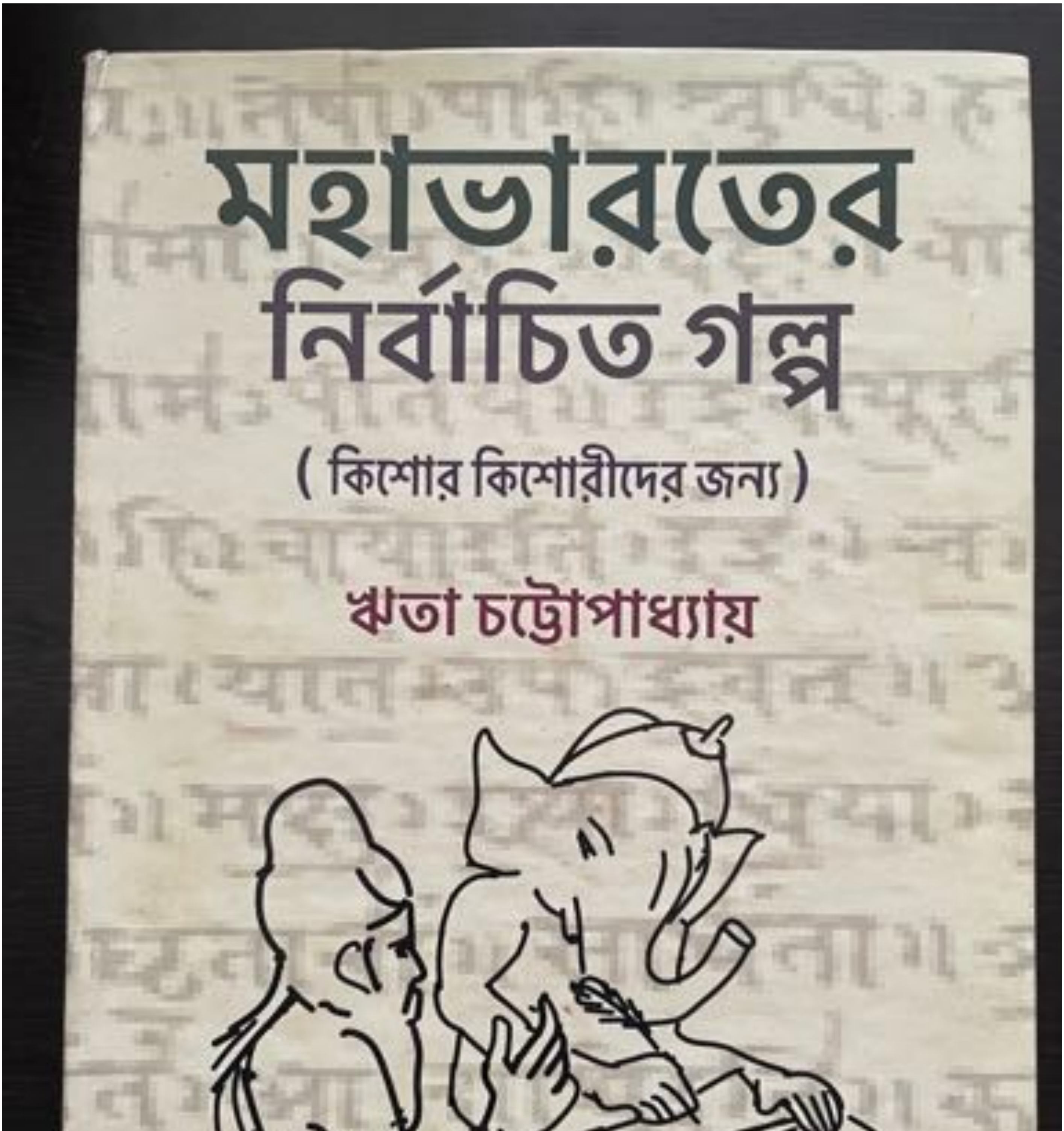
মহাভারতের
নির্বাচিত গল্প
(কিশোর কিশোরীদের জন্য)
ঋতা চট্টোপাধ্যায়

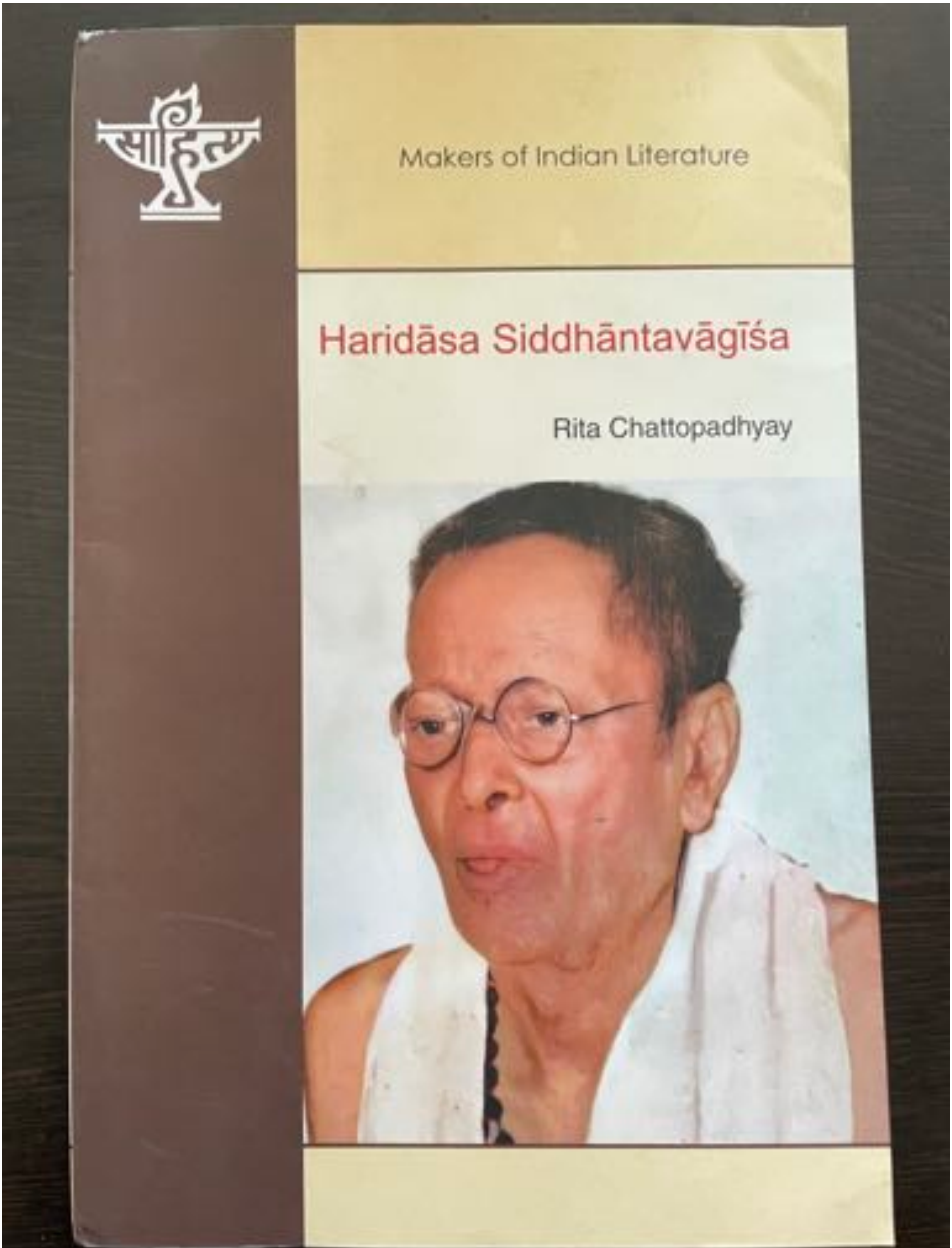
साहित्य
Makers of Indian Literature
Haridāsa Siddhāntavāgīśa
Rita Chattopadhyay

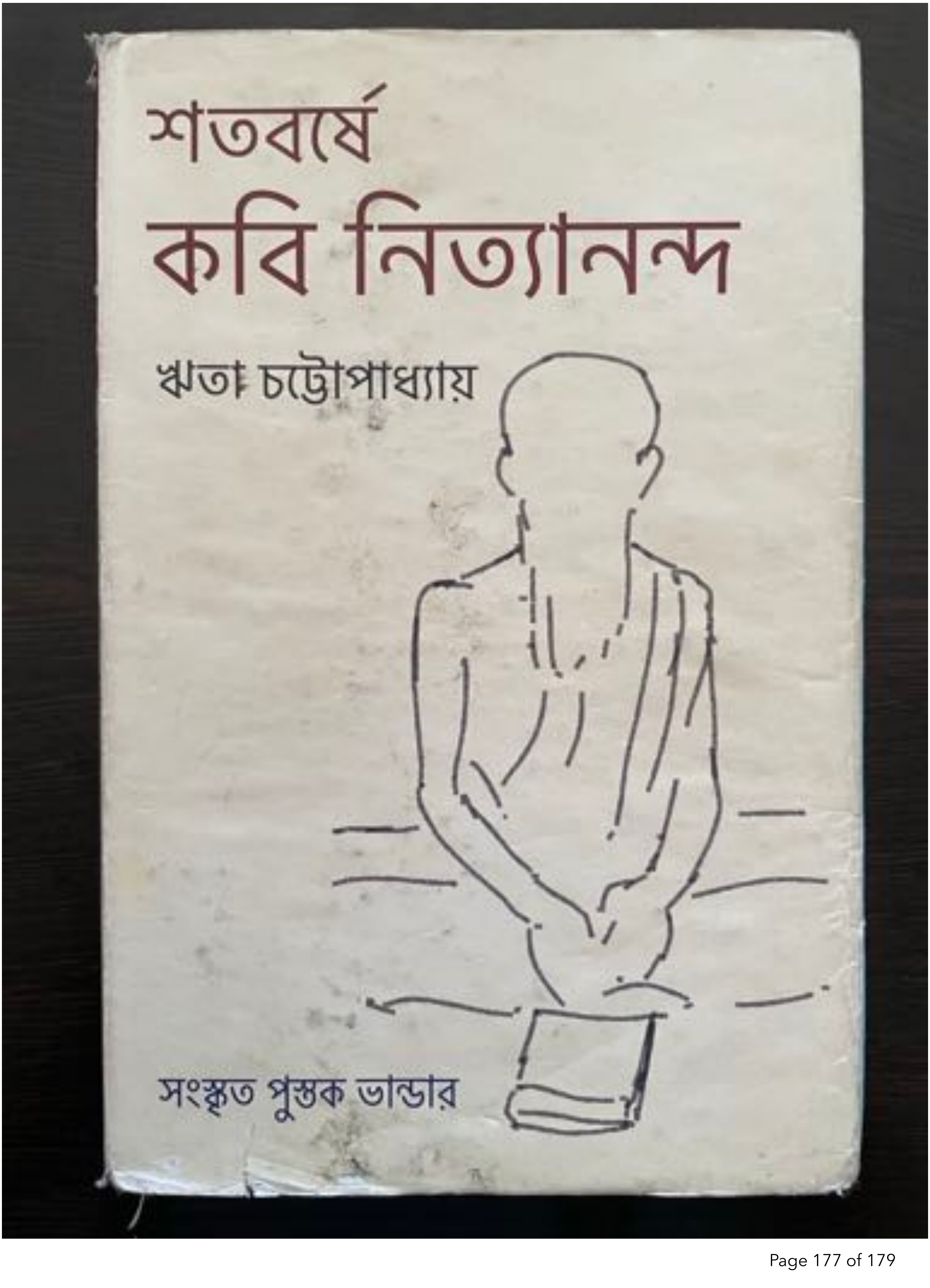
শতবর্ষে
কবি নিত্যানন্দ
ঋতা চট্টোপাধ্যায়
সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার

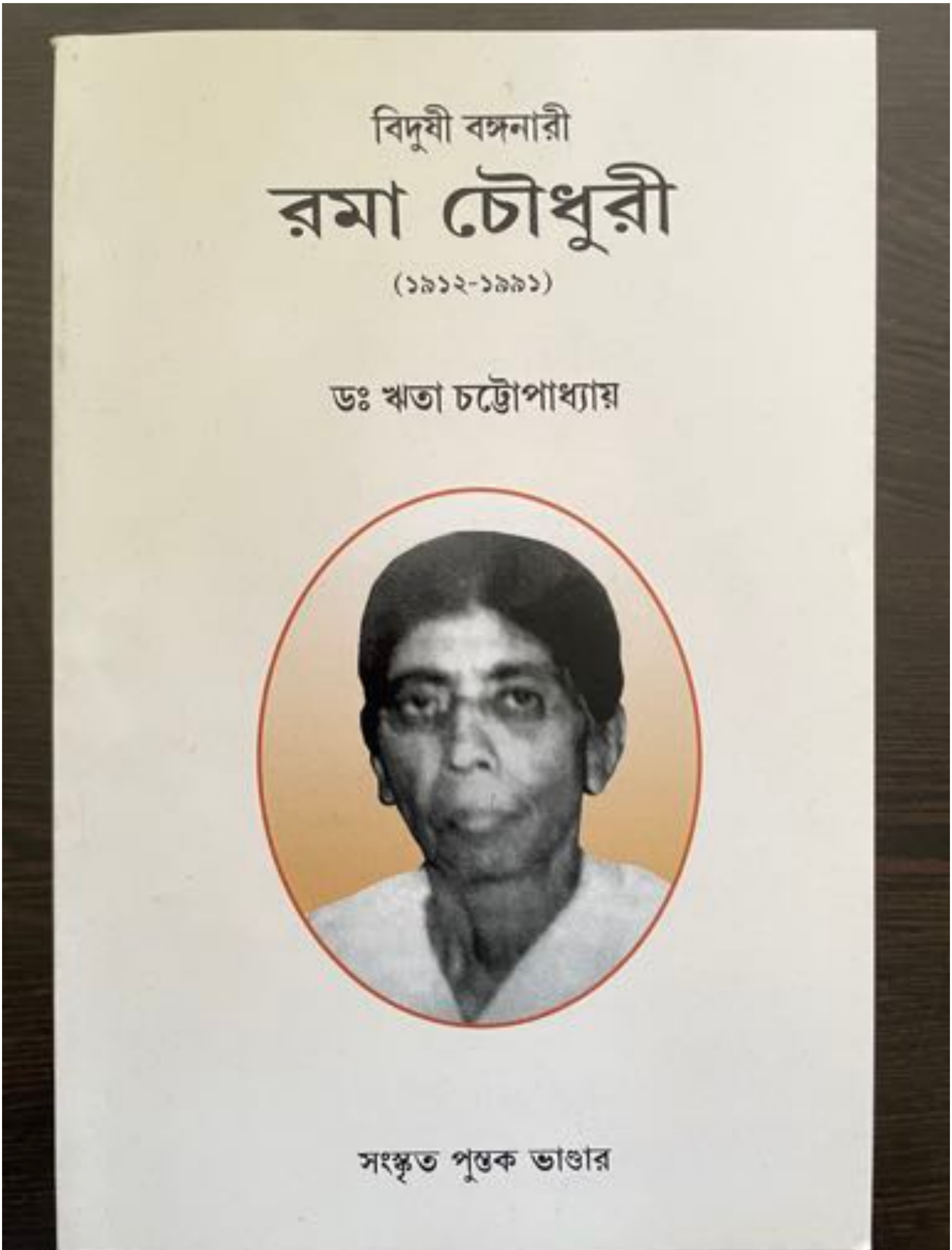
বিদুষী বঙ্গনারী
রমা চৌধুরী
(১৯১২-১৯৯১)
ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

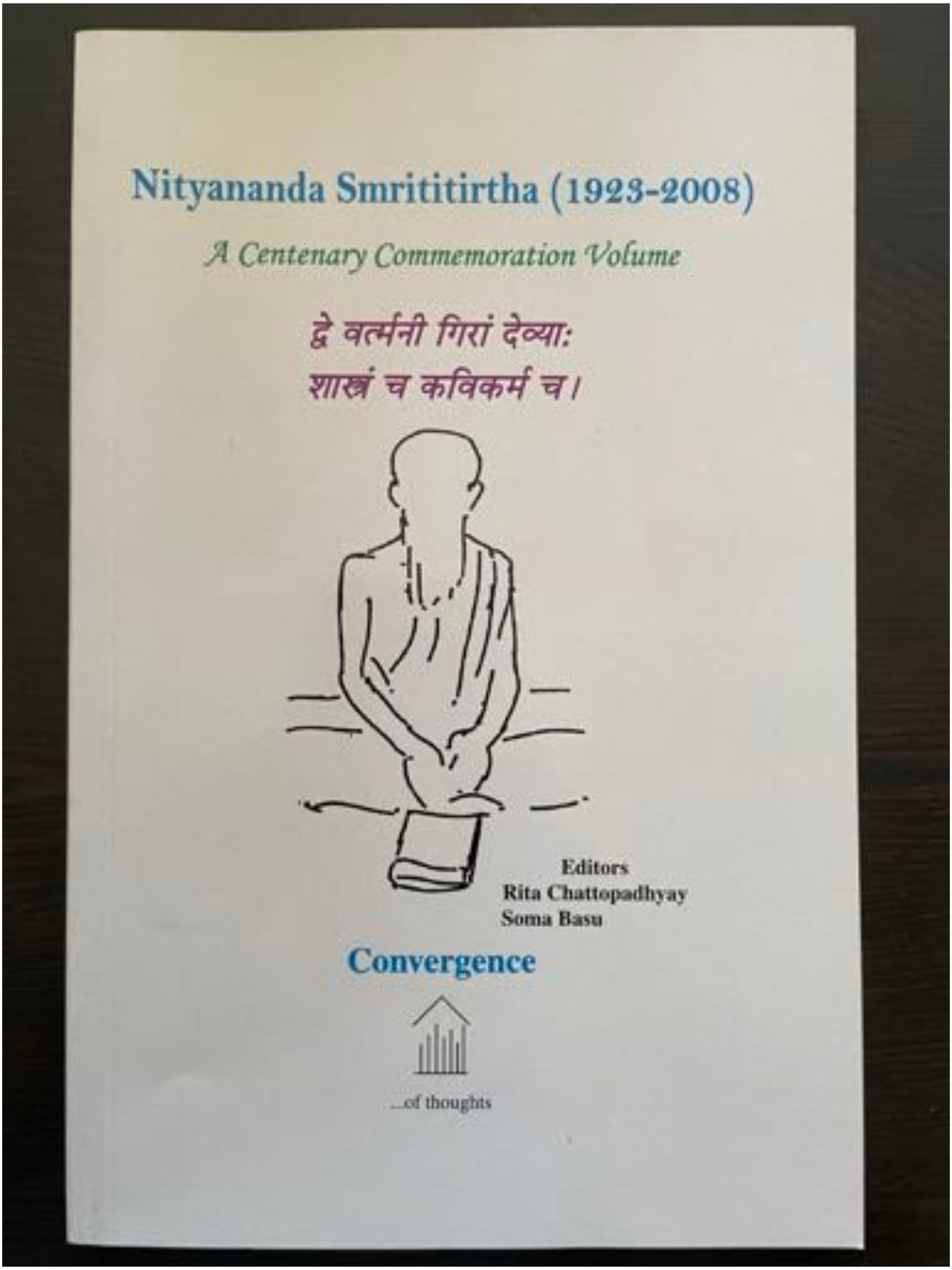
Nityananda Smrititirtha (1923-2008)
A Centenary Commemoration Volume
द्वे वर्त्मनी गिरां देव्याः
शास्त्रं च कविकर्म च।
Editors
Rita Chattopadhyay
Soma Basu
Convergence
...of thoughts